এপ্রিল ২০২০ ▪ চৈত্র ১৪২৬ – বৈশাখ ১৪২৭

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিববর্ষের আলোয় মুজিবনগর দিবস

মুজিব শতবর্ষ: শুভ সূচনা

বাংলা বর্ষপঞ্জির সংস্কার

আন্তর্জাতিক নারী দিবস: এগিয়ে চলেছে নারী

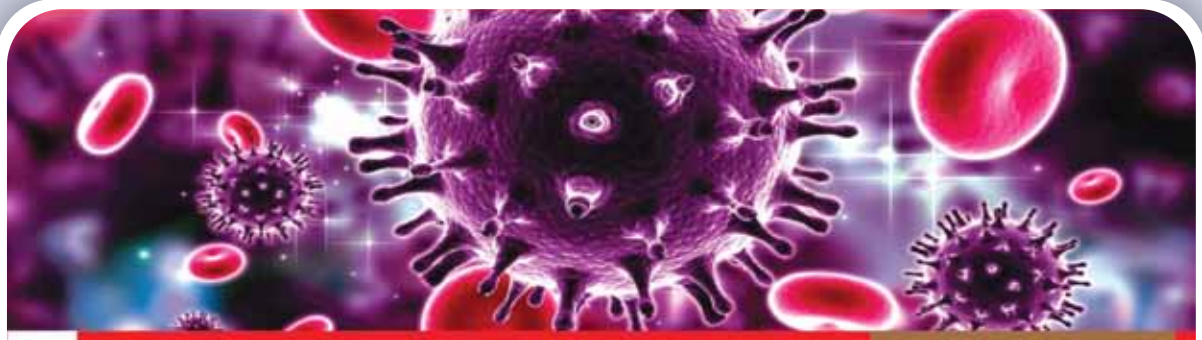

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০২০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

এপ্রিল ২০২০ ❑ চৈত্র ১৪২৬ – বৈশাখ ১৪২৭

মুজিবনগর কমপ্লেক্সে মহান মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য, মেহেরপুর

সম্পাদকীয়

প্রকৃতিতে পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনের আগমন ঘটেছে। এসেছে বাংলা নববর্ষ ১৪২৭। প্রতিবছরের মতো পুরাতন চলে গিয়ে এসেছে নতুন। বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব, বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মহামারি করোনার কারণে উদ্‌যাপিত হয়নি পহেলা বৈশাখ। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলেই সচেতনতা রক্ষা করে চলছে। সারা বিশ্বের এই করোনা বিপর্যয় জনজীবনকে করেছে বিচ্ছিন্ন।

বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম রাষ্ট্রপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৭ই মার্চ ১৯২০ জন্মগ্রহণ করেন। শুরু হয়েছে তাঁর জন্মশতবর্ষ। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ আড়ম্বরভাবে আয়োজনের পরিকল্পনা সত্ত্বেও করোনা মহামারির কারণে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সংক্ষিপ্ত করা হয় উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান। তবে তা বিশ্ববাসী ও বাঙালির আবেগ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ উদ্‌বোধন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশত উদ্‌বোধন নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর দিবস। মুজিবনগরেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। এ নিয়ে এই সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এগিয়ে চলেছে আমাদের নারীরা, এ নিয়েও রয়েছে নিবন্ধ। বাংলা বর্ষপঞ্জির সংস্কার নিয়ে রয়েছে তথ্যবহুল একটি নিবন্ধ। এছাড়া নিয়মিত বিভাগ তো রয়েছেই।

আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
মহাঃ শামসুজ্জামান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ

মুজিববর্ষের আলোয় মুজিবনগর দিবস ৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

মুজিব শতবর্ষ: শুভ সূচনা ৬
নাজমা ইসলাম

করোনার অভিজ্ঞতা: পরিবার পরিচালনা পুনর্গঠন ৮
ড. মোহাম্মদ হাননান

মুজিববর্ষের আলোকে আমাদের স্বাধীনতা ১০
মিলন সব্যসাচী

দেশে দেশে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন ১২
মোহাম্মদ খালিদ হোসেন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস: এগিয়ে চলেছে নারী ১৩
ইফফাত রেজা

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণকারীদের ডিএফপি'র সম্মাননা প্রদান ১৫
জে আর লিপি

নববর্ষের সর্বজনীনতা ১৭
শাফিকুর রাহী

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ১৯
ফারিহা রেজা

মনীষীর কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু: শিক্ষা ভাবনা ২০

বর্ষপণ্য: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ২২
সানিয়াত রহমান

অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির স্বজনই বঙ্গবন্ধু ২৩
রহিম আব্দুর রহিম

প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকার ২৪
মাহমুদ হাসান

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ২৫
কে সি বি তপু

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন ২৭
সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করুন
মাহবুবা আলম

আমাদের লোকজ শিল্প ও ঐতিহ্য ২৯
সাইমন ইসলাম সাগর

বাংলা বর্ষপঞ্জির সংস্কার ৩৩
সাবিত্রী রানী

হাইলাইটস

শব্দ দূষণ ও তার প্রতিকারে করণীয় ৩৫
শোভা রহমান

চলচ্চিত্র নির্মাণের একাল-সেকাল ৩৬
জেসিকা হোসেন

গল্প

সাক্ষী ৩৭
সাহিদা বেগম

কবিতাগুচ্ছ ৩২, ৪১, ৪২, ৪৩
আসাদ চৌধুরী, সোহরাব পাশা, হাসান হাফিজ গোপেশচন্দ্র সূত্রধর, গোলাম নবী পান্না, বাতেন বাহার আতিক আজিজ, মিয়াজান কবীর, শরীফা আক্তার বাঁশরী শাহনাজ, মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ, সাদিয়া রেজা অমিত নূরী, মো. জাবিদ হোসেন, সানিয়াত রহমান রুস্তম আলী, নির্মল চক্রবর্তী, আপন চৌধুরী

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৪
প্রধানমন্ত্রী ৪৫
তথ্যমন্ত্রী ৪৬
জাতীয় ঘটনা ৪৭
উন্নয়ন ৪৮
আন্তর্জাতিক ৪৯
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫০
শিল্প-বাণিজ্য ৫০
শিক্ষা ৫১
বিনিয়োগ ৫২
নারী ৫২
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৩
কৃষি ৫৪
বিদ্যুৎ ৫৪
কর্মসংস্থান ৫৫
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৬
নিরাপদ সড়ক ৫৬
স্বাস্থ্যকথা ৫৭
যোগাযোগ ৫৮
চলচ্চিত্র ৫৯
সংস্কৃতি ৬০
মাদক প্রতিরোধ ৬০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬২
ক্রীড়া ৬২
শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন সুরকার সেলিম আশরাফ ৬৪

মুজিববর্ষের আলোয় মুজিবনগর দিবস

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাত্রে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনে যখন মুজিবনগর অধ্যায়টি সংগঠিত হয়েছিল, তখন তিনি পাকিস্তানিদের কারাগারে। তাঁর নির্দেশ ও ছক অনুসারেই ১০ই এপ্রিল একাত্তরে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকা সত্ত্বেও তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর নেতৃত্বে এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানের পরিচালনায় সেই সরকার ১৭ই এপ্রিল প্রকাশ্যে মুজিবনগরে (মেহেরপুরের বৈদনাথতলা ভবের পাড়া) শপথ নিলে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরো জোরদার হয়ে ওঠে। গঠন করা হয় মুজিবনগর সরকারের সশস্ত্রবাহিনী– যা মুক্তিবাহিনী নামে পরিচিত ছিল। মুজিব জন্মশতবর্ষ পালনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে মুজিবনগর সরকারকে স্মরণ করতে হবে। কারণ এ সরকার পরিচালকরা মুজিবের বিশ্বস্ত অনুচর ও তাঁর আদর্শের পরীক্ষিত বিশ্বাসী। এ বিষয়ে 'মুজিববর্ষের আলোয় মুজিবনগর দিবস' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ুন পৃষ্ঠা–৪

মুজিব শতবর্ষ: শুভ সূচনা

বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের সতেরোই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলাধীন টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শত সংগ্রাম, আন্দোলন ও লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাঙালির স্বরাজ এনে দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে দিয়েছেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও সংবিধান। দেশের মানুষ যাঁকে ভালোবেসে ডাকে 'বঙ্গবন্ধু', স্বীকৃতি দিয়েছে জাতির পিতা হিসেবে, সেই অবিসংবাদিত নেতার শততম জন্মবার্ষিকীতে বাংলার মানুষ চেয়েছিল সাড়ম্বরে মুজিববর্ষ হিসেবে উদ্‌যাপন করতে। সেই অনুযায়ী ব্যাপক আকারে মুজিববর্ষ পালনের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু মুজিববর্ষ ক্ষণগণনা পর্বেই বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সংক্ষিপ্ত করা হয় মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন কর্মসূচি। তবে কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করার এবং জনসমাগম এড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকীতে বাঙালির আবেগ ও ভালোবাসা প্রকাশে কোনো ছন্দপতনই ঘটেনি। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের সূচনা নিয়ে 'মুজিব শতবর্ষ: শুভ সূচনা' শীর্ষক নিবন্ধ পড়ুন পৃষ্ঠা–৬

আন্তর্জাতিক নারী দিবস
এগিয়ে চলেছে নারী

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। যথাযথ মর্যাদায় নারী দিবস পালিত হয়েছে। নারী শুধু গৃহেই আবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে সমাজ থেকে রাষ্ট্রের সর্বত্র। নারী কর্মী থেকে শুরু করে কর্মকর্তা পর্যায়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। দপ্তরপ্রধান থেকে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করছে নারী। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে একটি নিবন্ধ। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস: এগিয়ে চলেছে নারী' শীর্ষক নিবন্ধ পড়ুন পৃষ্ঠা–১৩

বাংলা বর্ষপঞ্জির সংস্কার

বাংলা সন একেবারেই স্বকীয়। বাংলা সন বাংলাদেশ ও বাঙালির জাতিসত্তার পরিচয়জ্ঞাপক। তাই এ সন বাঙালির এত প্রিয়, জনজীবনে এত গুরুত্ববহ। এটি সাল, বঙ্গাব্দ নামেও পরিচিত। বাংলা বর্ষপঞ্জি সংস্কারে ভূমিকা পালন করে বাংলা একাডেমি। ২০১৫ সালে এ একাডেমি বাংলা বর্ষপঞ্জির বিদ্যমান অসামঞ্জস্য দূর করে পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং জাতীয় দিবসগুলোকে মূলানুগ করতে সর্বশেষ সংস্কার কমিটি করে এবং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাংলা বর্ষপঞ্জি ১৪২৬ বঙ্গাব্দ থেকে চালু হয়েছে। 'বাংলা বর্ষপঞ্জির সংস্কার' বিষয়ে নিবন্ধ পড়ুন পৃষ্ঠা–৩৩

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

মুজিববর্ষের আলোয় মুজিবনগর দিবস

খালেক বিন জয়েনউদদীন

সতেরোই মার্চ ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের এদিন তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলাধীন টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরের জন্মদিন তাই জন্মশত বছরের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে জন্মশত বছরের নানা কর্মসূচি, চলবে আগামী বছরের জন্মদিন পর্যন্ত।

আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা তাঁর সংগ্রাম ও আন্দোলনের সরণিতে সঙ্গী ছিলাম। আমরা তাঁর ডাকেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তথা মুক্তিযুদ্ধ কিংবা স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। সেই যুদ্ধে আমাদের শত্রু ছিল দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও ঘরের শত্রু কিছু রাজাকার, আলশামস ও আলবদর বাহিনী। আর আমাদের মিত্র ছিল– ভারত, ভুটান, রাশিয়া, পোল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষ। সেই একাত্তরের যুদ্ধে দুই পরাশক্তি চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পরাজিত করেছিলাম পাকিস্তানিদের এবং পাকিস্তানি দোসরদের। শুধু পরাজিত নয়, আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিলাম পৃথিবীর ঘাগুসৈন্য পাকিস্তানিদের।

শুধু একাত্তরের যুদ্ধই নয়, বাঙালির দুই হাজার বছরের মহাজাগরণের মহানায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শত সংগ্রাম, আন্দোলন ও লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে তিনি বাঙালির স্বরাজ এনে দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে কৈশোর থেকে একাত্তর পর্যন্ত জেল-জুলুম ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। তাঁর সংগ্রামী জীবন ছিল কণ্টকাকীর্ণ। শত্রু তাড়িয়ে যখন দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত তিনি, তখনই আবার একাত্তরের শত্রুদের যোগসাজশে তাঁকে সপরিবারে জীবন দিতে হলো। বাঙালির সকল অর্জন, বাংলাদেশের সকল আকাঙ্ক্ষা বিনাশ করেছিল পঁচাত্তরের খুনিরা।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বছরের দীপ্ত আলোয় আমরা আজ বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, মানুষরূপী এই নরপশুরা কি মুজিবের অবয়ব মুছে ফেলতে পেরেছে? তবে হ্যাঁ, খোনকার, জিয়া, এরশাদ ও খালেদারা সেই অপচেষ্টা চালিয়েছিল, বিভ্রান্ত করেছিল বাঙালিকে, একাত্তর তথা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের অধ্যায়গুলো। কিন্তু শেখ মুজিব এখন বাংলাদেশ ও বিশ্বের ধরাতল ছাড়িয়ে মহাশূন্যের মহা ব্রহ্মাণ্ডে। গর্ব এবং অহংকার নয়, এটা শেখ মুজিবের কীর্তিরই প্রাপ্তি। শত বছরের আলোয় আজ তিনি নক্ষত্ররাজ।

বঙ্গবন্ধুর জীবনে যখন মুজিবনগর অধ্যায়টি সংগঠিত হয়েছিল, তখন তিনি পাকিস্তানিদের কারাগারে। তাঁর নির্দেশ ও ছক অনুসারেই ১০ই এপ্রিল একাত্তরে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করা হয়েছিল। তখন পাকিস্তানিরা সেই ২৫শে মার্চ বাঙালিদের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের অঞ্চলগুলো দখল নিতে শুরু করেছিল। পাকিস্তানিদের সেই জেনোসাইড পৃথিবীর সকল হত্যাকে ম্লান করে দিয়েছিল। ঘরবাড়িহারা মানুষ তখন আশ্রয় নিয়েছিল পড়শি মিত্র ভারতে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এবং সৈয়দ নজরুল

১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়–ফাইল ছবি

ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানের পরিচালনায় সেই সরকার ১৭ই এপ্রিল প্রকাশ্যে মুজিবনগরে (মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা ভবের পাড়া) শপথ নিলে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরো জোরদার হয়ে ওঠে। গঠন করা হয় মুজিবনগর সরকারের সশস্ত্রবাহিনী– যা মুক্তিবাহিনী নামে পরিচিত ছিল। আর এ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল চাকরিরত বেঙ্গল রেজিমেন্টের স্বাধীনতাকামী বাঙালি সৈনিক, ইপিআরের জোয়ান, বাঙালি পুলিশ, আনসার-মুজাহিদ এবং স্বাধীনতাকামী সকল পর্যায়ের মানুষ।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সালাম নিচ্ছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

আর এসময়ে চট্টগ্রামের রেডিও পাকিস্তানকেন্দ্রের বেতার কর্মী বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র নামে একটি বেতারকেন্দ্র যুদ্ধের খবর প্রচার-প্রচারণা শুরু করে। ১৯৭২ সালের ২২শে জানুয়ারি পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম চলে। এই কেন্দ্র থেকেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬শে মার্চ পাঠ করে শোনান আওয়ামী লীগের স্থানীয় সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান। অবশ্য এই ঘোষণা তিনি প্রথম পাঠ করে শোনান আগ্রাবাদে অবস্থিত রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রাম কেন্দ্রে দুপুরে।

মেহেরপুরের সেই বৈদ্যনাথতলাই মুজিবনগর। একাত্তরের বিপ্লবী সরকারের প্রথম রাজধানী। ১৭ই এপ্রিল সেই শপথ অনুষ্ঠানে আমাদের জাতীয় চার বীর সংগঠক সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম, কর্নেল ওসমানী, মহকুমা প্রশাসক (এসডিও) ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী, ঝিনাইদহ পুলিশ কর্মকর্তা মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, কোরান তেলোয়াতকারী মো. বাকের আলী, স্থানীয় মিশনের সিস্টার তেরোজিনা, স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির সদস্য, জাতীয় সংগীত পরিবেশনকারী দাড়িয়াপুরের আসাদুলের দল এবং স্থানীয় আনসার, চৌকিদার ও দফাদারদের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। ৩৯টি দেশের সাংবাদিকবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন। ১৮ই এপ্রিল গোটা বিশ্বে বাংলাদেশ নামের একটি নতুন রাষ্ট্রের খবর ছাপা হয়। বিবিসি প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠান। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র তো তখন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিষ্ঠান। সেকি উত্তেজনা, আনন্দ ও প্রতিরোধের পাশাপাশি শত্রুসেনার হামলার আশঙ্কা। উল্লেখ্য, মুজিবনগর সরকার প্রবাসী সরকার নামেও খ্যাত। এই সরকারের কাজকর্ম সম্পাদিত হতো কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে। তবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র শপথ অনুষ্ঠানেই গৃহীত হয় যা পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

মুজিব জন্মশতবর্ষ পালনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে এসব জাতীয় বীরদের স্মরণ করতে হবে। কারণ এঁরা ছিলেন মুজিবের অনুচর ও তাঁর আদর্শের পরীক্ষিত বিশ্বাসী। আর মুজিবনগর সরকারের চার জাতীয় নেতাকে একই কারণে বঙ্গবন্ধুর খুনিরা বন্দি অবস্থায় হত্যা করে। পঁচাত্তর থেকে একাশি সাল পর্যন্ত ছিল আমাদের দুঃসময়। এসময় খুনিদের পরামর্শক, নির্দেশদাতা ও মদদদাতারা ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুকে নিষিদ্ধ করে একাত্তরের সকল আয়োজন বিনষ্ট করে। সংবিধান ফেলে দেয় বুড়িগঙ্গায়। প্রজন্মকে শুনতে হয় বিভ্রান্ত ইতিহাস। শুধু তাই নয়, এসময় মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী মানুষের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়কদের।

পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত আমাদের দিনপঞ্জিতে এপ্রিলের ১৭ তারিখটি ছিল কালোকালিতে মাখা। ক্ষমতাসীনরা কখনো মুজিবনগরমুখী হয়নি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে একাত্তরে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল, একটি সরকার গঠিত হয়ে পরিচালিত হয়েছিল– তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই গভীর ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর মূল সংগঠকদের হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ নিয়েছিল স্বাধীনতাবিরোধী চক্র। কিন্তু তাদের স্বপ্ন কি সফল হয়েছিল? হয়নি। তারা হারিয়ে গেছে কালের আবর্তে। ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেনি। এটাই বিধাতার অমোঘ বিধান। অসত্য ক্ষণস্থায়ী, সত্য চিরস্থায়ী।

বাংলার আকাশে, বাতাসে, ধরাতলে, মাঠে-প্রান্তরে জয় বাংলার জয়ধ্বনি। শেখ মুজিবের দীপ্ত দৃঢ় অবস্থান। সাধারণ মানুষের অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মাখা তাঁর প্রতিচ্ছবি। একারণেই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অভিন্ন এক সত্তা। শত বছরের খেয়ায় আজো তিনি এই শ্যামল জনপদের প্রিয়তম কাণ্ডারি। তিনি আজো আমাদের প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের আদর্শ। তাঁর সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁকে যারা নানাভাবে সহযোগিতা, পরামর্শ, উপদেশ, সাহচর্য ও প্রত্যক্ষভাবে অনুসারী হয়ে চলার পথ সুগম করেছেন, বিশেষভাবে তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। তাইতো নজরুলের ভাষায় বলব–

কোনো কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

জন্মশতবর্ষের দীপ্ত আলোয় বঙ্গবন্ধু চির অম্লান থাকুক। বাংলাদেশ চিরকাল অক্ষয় থাকুক। কালচক্রে ফিরে আসুক মুজিবনগর দিবস। আমাদের প্রত্যাশার ফুল ফুটুক এ মাটিতে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

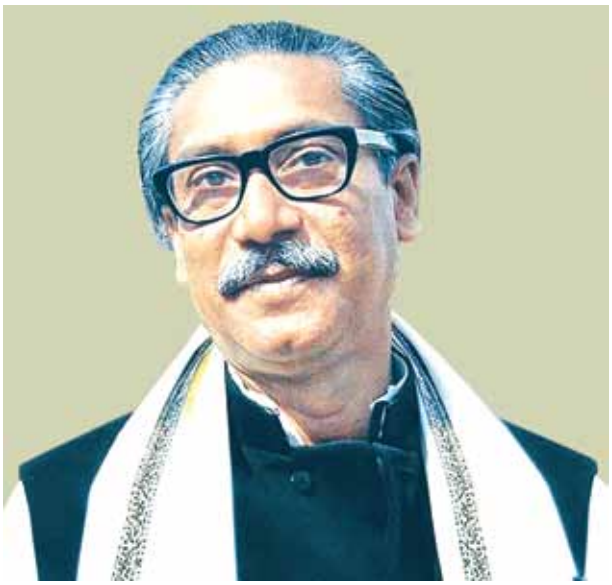

মুজিব শতবর্ষ: শুভ সূচনা

নাজমা ইসলাম

সময়ের আর্বতে বর্ষপঞ্জির আকাশে ১৭ই মার্চ দেখা দিয়েছিল সেই মানুষটির জন্মশতবার্ষিকী যিনি নিজে কখনো জন্মদিন পালন করেননি। ১৭ই মার্চ বাংলাদেশের মানুষ ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা ভরে পালন করেছেন মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, জানিয়েছেন লাল সালাম, কেননা বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ।

বাঙালি জাতিকে শেখ মুজিবুর রহমান দিয়েছেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও সংবিধান। দেশের মানুষ যাঁকে ভালোবেসে ডাকে 'বঙ্গবন্ধু', স্বীকৃতি দিয়েছে জাতির পিতা হিসেবে, সেই অবিসংবাদিত নেতার শততম জন্মবার্ষিকীতে বাংলার মানুষ চেয়েছিল সাড়ম্বরে মুজিববর্ষ হিসেবে উদ্‌যাপন করতে। সেই অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক আকারে মুজিববর্ষ পালনের পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। কিন্তু মুজিববর্ষ ক্ষণগণনা পর্বেই বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে পালটে যায় সামগ্রিক পরিস্থিতি। জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সংক্ষিপ্ত করা হয় মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন কর্মসূচি। তবে কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করার এবং জনসমাগম এড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকীতে বাঙালির আবেগ ও ভালোবাসা প্রকাশে কোনো ছন্দপতনই ঘটেনি।

বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনই নিবেদিত ছিল বাংলার মানুষের জন্য। ১৭ই মার্চ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির বাইরেও অসংখ্য মানুষকে দেখা গেছে রাজধানীর ৩২ নম্বর ধানমন্ডি মুখো হতে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অনেকেরই গন্তব্য ছিল গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিসৌধ। বঙ্গবন্ধুর প্রাণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলার দৃঢ় শপথ নিয়েছে গোটা জাতি।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ রাত ৮টায় টুঙ্গিপাড়ায় জন্মেছিলেন বাঙালির আরাধ্য মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই ১৭ই মার্চ জন্মবার্ষিকীর মূল আয়োজন উপলক্ষ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল এ ক্ষণকেই। ঘড়ির কাটায় ঠিক যখন রাত ৮টা তখনই রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উদ্‌বোধন। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ছড়িয়ে পরে প্রাণের উচ্ছ্বাস। জনসমাগম এড়াতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আতশবাজি উৎসব এবং জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় পিক্সেল ম্যাপিং প্রদর্শনের মাধ্যমে মুজিববর্ষের উদ্‌বোধন পর্বটি বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ দেশের সব টেলিভিশন চ্যানেলে, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় একযোগে সম্প্রচার করা হয়। আতশবাজির পরপর 'মুজিব মহানায়ক' শিরোনামে দুই ঘণ্টার একটি অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়। ধারণকৃত এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণ প্রচার করা হয়।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর ভাষণে বলেন– মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই হোক মুজিববর্ষে সবার অঙ্গীকার। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছড়িয়ে পড়ুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর আদর্শ ধারণ করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন– আমরা জেগে রইবো তোমার আদর্শ বুকে নিয়ে, জেগে থাকবে এ দেশের মানুষ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম তোমার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে। তোমার দেওয়া পতাকা সমুন্নত থাকবে চিরদিন। এই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিশ্বনেতা ও সংস্থাপ্রধানের পাঠানো ভিডিও বার্তা প্রচারিত হয়। ভিডিও বার্তায় পাঁচ বিদেশি ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভান্ডারী, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং, জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেস এবং ওআইসির মহাসচিব ইউসেফ বিন আল ওথাইমিন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ ২০২০ গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনির-এর মোড়ক উন্মোচন করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ই মার্চ ২০২০ টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিমানবাহিনীর এয়ার শো উপভোগ করেন। জাতির পিতার দুই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং পরিবারের সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভিডিও বার্তায় করোনা ভাইরাসের কারণে মুজিব শতবর্ষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তিদের একজন। যার পুরো জীবন আমাদের জন্য প্রেরণা। ভিডিও বার্তায় নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভান্ডারী বলেন– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশের স্বাধীনতা এবং জনগণ ও ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক ত্যাগ করেছেন। নেপাল ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুসম্পর্ক রয়েছে জানিয়ে, এই সম্পর্ক উত্তরোত্তর বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন নেপালের রাষ্ট্রপতি। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং বলেন, আজকে আপনাদের জাতির পিতার জন্মের ১০০বছর পূর্তিতে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। ভুটানের জনগণও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। এক হাজার ঘি প্রদীপ জ্বালিয়ে বঙ্গবন্ধুর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করেছে।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী স্মরণ করে রাত ৮টায় লাল-নীল আতশবাজিতে বর্ণিল সাজে সেজেছিল ঢাকার আকাশ। রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এই আতশবাজি আর ফানুস ওড়ানোর কর্মসূচি পালন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি। রাত ৭টা ৫৯ মিনিটে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভের চারপাশ থেকে ভেসে আসে আসাদুজ্জামানের ভরাট কণ্ঠ। তিনি অভিবাদন জানান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে। ঘড়ির কাটা রাত ৮টাকে স্পর্শ করতেই স্বাধীনতা স্তম্ভের গ্লাস টাওয়ারের চারপাশ থেকে শুরু হয় আলোর রোশনাই। ছড়িয়ে পড়ে জনতার হর্ষধ্বনি। ছয় মিনিট দশ সেকেন্ডের এই আতশবাজির সময় আবহে ভেসে বেড়িয়েছে 'শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠ', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'জয় বাংলা বাংলার জয়',– এই তিনটি গান।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ই মার্চ শিশু দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য– মুজিববর্ষে সোনার বাংলা ছড়ায় নতুন স্বপ্নাদেশ, শিশুর হাসি আনবে বয়ে আলোর পরিবেশ। পরিকল্পনা ছিল, শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্কুল-কলেজে বিভিন্ন কর্মসূচি উদ্‌যাপন করা হবে। বাবাকে নিয়ে শিশুদের উদ্দেশে লেখা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার লেখা একটি চিঠি কোটি শিশু একসঙ্গে পাঠ করবে। কিন্তু কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে চিঠিটি শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তবে টিভিতে প্রচারিত ধারণকৃত অনুষ্ঠান মুক্তির মহানায়ক শীর্ষক অনুষ্ঠানটি শুরু হয় শিশুর কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় কবি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী রচিত উৎসব সংগীত, যাতে দেশের প্রথিতযশা শিল্পীদের সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর আরেক কন্যা শেখ রেহানা। শেখ রেহানার লেখা কবিতা 'বাবা' আবৃত্তি করেন শেখ হাসিনা। শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায়, 'হে জ্যোতির্ময় মহামানব' শীর্ষক ৪০ মিনিটের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। নৃত্য পরিচালক আকরাম খানের পরিচালনায় ছিল থিয়েট্রিক্যাল পারফরম্যান্স।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পালিত হয়। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐদিন সকাল ১০টায় টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাতে অংশ নেন। এসময় তিন বাহিনীর সুসজ্জিত দল গার্ড অব অনার দেয়। বাজানো হয় বিউগল। এর আগে সকাল ৭টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর স্বাধীনতার এই মহান স্থপতির প্রতি সম্মান জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। এই সময় সেনাবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল অভিবাদন জানান। পরে দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে আরেকটি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন শেখ হাসিনা।

দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার এবং সংবাদপত্রগুলোতে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও নিবন্ধ প্রচার করা হয়। ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ দেশের সব মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সকালে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে হিন্দু সম্প্রদায়, তেজগাঁও গির্জা, মীরপুর ব্যাপ্টিস্ট চার্চে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় এবং মেরুল বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে পৃথকভাবে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের সব হাসপাতালে, কারাগারে, এতিমখানায় মিষ্টি ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন থেকে দেশের গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান করা হয়। বিদেশি দূতাবাস ও মিশনগুলোতেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

মুজিববর্ষের 'থিম সংগীত' ছিল– তুমি বাংলার ধ্রুবতারা/তুমি হৃদয়ের বাতিঘর। শত যন্ত্রসংগীত শিল্পীদের সুরের মূর্ছনায় উপস্থাপিত হয়েছে জাতির পিতার জীবনের নানা অধ্যায়। শতাব্দীর মহানায়ক শীর্ষক মনোমুগ্ধকর থিয়েট্রিক্যাল কোরিওগ্রাফির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ, সাহস, সংগ্রামের বিবরণসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা। জাতীয় সংসদ ভবন থেকে পিক্সেল ম্যাপিং বা লেজার শোর মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। আতশবাজির মতো লেজার শোটিও সরাসরি সম্প্রচারিত হয় বিটিভি'র পর্দায়।

লেখক: প্রাবন্ধিক

করোনার অভিজ্ঞতা
পরিবার পরিচালনা পুনর্গঠন

ড. মোহাম্মদ হাননান

একটা কঠিন বাস্তবতায় সমগ্র দুনিয়া এখন ঘুরপাক খাচ্ছে– আমরা সবাই বেঁচে থাকব কি থাকব না! মানুষ মনে করত তারা খুব শক্তিশালী হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তিতে তাদের অগ্রগতিতে সীমাহীন শক্তির বার্তা ছিল। ছোট্ট একটা করোনা ভাইরাস মানুষের দম্ভকে চুরমার করে দিয়েছে। মানুষ দুনিয়ার এপাশ থেকে অন্য পাশে এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রযুক্তির শক্তি করোনা-প্লাবন মোকাবিলা করতে পারল না।

এ অবস্থার মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিতে আছে আমাদের সমাজে নারীরা এবং সকল প্রকার শিশুরা, তবে কন্যাশিশুরা যেন একটু বেশি অসহায়। তাদের সবাইকে সুরক্ষা দেওয়া আমাদের পরিবারের সকল সদস্য এবং গৃহকর্তার প্রধান দায়িত্ব। মনে রাখতে হবে, আমাদের নারী ও কন্যাশিশুরা করোনার এ পরিস্থিতিতে ভালো নেই।

তাদের সুরক্ষিত রাখতে আমরা কী কী করতে পারি– এ নিয়ে আমরা পরিবারের সদস্যরা সবাই বসে পরামর্শ করতে পারি। বাসার যাবতীয় কাজের একটা তালিকা প্রথম তৈরি করি। এবার কাজ এবং সময় ভাগ করে পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে তা বণ্টন করি। আগে তো এমন ছিল, পরিবারের পুরুষ সদস্য অফিস বা ব্যবসার কাজে বাইরে ব্যস্ত থাকত। সারাদিন পর ঘর্মাক্ত এবং ক্লান্ত এ সদস্যকেই সেবা দেওয়ার জন্য পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রস্তুত থাকতে হতো। যদি নারী সদস্যও কর্মজীবী (ওয়ার্কিং মাদার) হতো, তাহলেও তাকে প্রস্তুত থাকতে হতো কর্মজীবী পুরুষ সদস্যকে সেবা দেওয়ার জন্য। ওয়ার্কিং মাদারকে দেখবে কে!

কঠিন হলেও এটা সত্য, একটা প্রথায় পরিণত হয়েছিল। করোনা ভাইরাস যেন এ জায়গাটায়ও আঘাত করেছে। এখন আর কারো কাজ নেই, সবারই কর্মস্থল বন্ধ। নিজেরাই আমরা সবাই নিজেদের অবরুদ্ধ করে রেখেছি। এখন অভ্যাস পরিবর্তনের সময়। এ সময়টা যদি আমরা কাজে লাগাতে না পারি তাহলে সমাজ পরিবর্তনের লড়াইটা একটা স্লোগান হিসেবে থেকে যাবে।

পূর্বেই বলেছিলাম বাসার কাজগুলোর একটা তালিকা করা এবং সময় ভাগ করে দায়িত্ব বণ্টনের কাজটি জরুরি। আমাদের সমাজে কতগুলো সনাতন এবং আবেগীয় মূল্যবোধ আছে। এগুলো ঝেড়ে ফেলতে হবে। রান্নাঘরটা ভাগ নয়, রান্নাঘরের কাজটা ভাগ করে দেওয়া যায়। মা, স্ত্রী, বোন, কন্যা– এ জাতীয় নারী-কর্তাগণ মনে করেন রান্নাঘরটা তাদের দখল করে রাখতে হবে। তাই পুরুষ সদস্য– বাবা, ছেলে, স্বামী, ভাই ও এ জাতীয় পুরুষরা ছোটোবেলা থেকেই রান্নাঘর থেকে দূরে থাকার বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

এখন এ করোনাকালে নারী-পুরুষ, বাবা-মা, ভাইবোন সবাই ঘরে। এখনই সময় সনাতন মূল্যবোধে ধাক্কা দেওয়ার। সবাই কিছু কিছু কাজ করব। কেউ বলব না, 'আমি এটা পারি না, আমার এ ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই'। কোনোদিন একবার না করলে কোনোদিন আর অভিজ্ঞতা হবে না। তাই প্রথম প্রথম অল্প অল্প করে কিছু কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি। প্রথমদিন ভাতটা আমি (পুরুষ সদস্য) নাই-বা রাঁধলাম। চালটা তো ধুয়ে দিতে পারি! সিঙ্কে কল ছেড়ে চালগুলো আস্তে আস্তে ধুয়ে দেওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়। এই ফাঁকে আমার জানা হয়ে গেল পরিবারে প্রতিদুপুরে, প্রতিরাতে কতখানি চাল লাগে, পট (পাত্র) দিয়ে মেপে চালগুলো আমিই (বাবা) ধুয়ে দিলাম। ছোটো ছেলেকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছিলাম, ওকে বললাম, 'তুই চুলাটা জ্বালিয়ে দে'।

কেউ আপত্তি করতে পারেন, প্রথমদিনই ছোটো ছেলেকে কেন চুলা জ্বালানোর দায়িত্বটা দিলাম! উত্তরটা সোজা, ও এতে আনন্দ পাবে, সংসারের কাজে জড়াচ্ছে একেবারে আগুন জ্বেলে। হয়ত হাতটা সামান্য পুড়ে যেতে পারে প্রথমদিন বলে, একটু পুড়ুক না, আমাদের মা-বোন-স্ত্রী-মেয়ে এমনি করে কতদিন আগুন জ্বালাতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে তাতে লবণ পানি দিয়েছে, আমরা তার কী খবরইবা রাখি!

ঘরের একটা সহজ কাজ কাপড়চোপড় ধোয়া-পাকলা। এখন গৃহপরিচারিকা নেই। তাই প্রথমদিনই পরিবারের পরামর্শ সভায় রাখতে হবে, যার যার কাপড়চোপড় গোসল করার সময় তার তারটা নিজেই ধুয়ে ফেলতে হবে। আমি গৃহকর্তা একদিন পরপর বাসার সকলের কাপড়চোপড়ই ধুয়ে ফেলতে পারি। আমাকে কেউ বকুনি দিবে না, বরং মা, স্ত্রী বা কন্যা এসে আমার হাত যেন খসখস না হয় তারজন্য একটু 'বডি-লোশন' মেখে দিতে পারে। এতে পারিবারিক বন্ধনটা দৃঢ় ও গাঢ় হবে।

স্কুল পড়ুয়া ছেলে এমন একটা পরিবেশ দেখলে সে নিজেও কিছু কাজ করার বায়না ধরবে। তাকে প্রথম প্রথম খাওয়ার আগে থালা বাসন, গ্লাস, চামচ ইত্যাদি ধোয়ার দায়িত্ব দেওয়া যায়। খাওয়ার পরেও সকলের এঁটো বাসন ও গ্লাস সে-ই ধুয়ে ফেলতে পারে। শুকনো কাপড়গুলো ভাঁজ করার দায়িত্ব সে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পেতে পারে।

একটা অভিজ্ঞতা অন্য কারণে এখানে বলছি। প্রতিবছর পরীক্ষার পর এসএসসি'র অনেক ছাত্র তাবলিগ জামাতে যায়। সেখানে তারা নিজের মশারি ও বিছানা প্রতিরাতে নিজেই তৈরি করে, সকালে আবার তা গুছিয়ে ফেলে। গোসলের পর যার যার ভেজা কাপড় নিজেই ধুয়ে শুকিয়ে নেয়। পালাক্রমে রান্নার দায়িত্বও সে পায়। খুব সুন্দর এবং মজাদার রান্নাও সে করে। জীবনে বড়ো হওয়ার, স্বনির্ভর হওয়ার একটা ট্রেনিং সে এখানে পেয়ে যায়। অথচ একদিন আগেও সে নিজে নিজের হাতে ভাত খেত না, মা-ই তাকে প্রতিদিন খাইয়ে দিত, যেন 'ননীর পুতুল' ছিল সে। অভিজ্ঞতাটি এজন্য বললাম যে, ঘরের পুরুষ সদস্যদের গৃহ কাজে ট্রেনিং দেওয়ার দায়িত্বটি আমাদের ঘর থেকেই শুরু করতে হবে। অনেক সময়ই মা আদর করে ছেলের কষ্ট হবে বলে তা করতে দেন না, কিন্তু কন্যাশিশু যখন এরকম কাজ করতে এগিয়ে আসে, তখন কিন্তু মা তাকে বাধা দেন না।

আমাদের সমাজে একটা বাস্তব বিষয় সব সময় দেখি, ঘরের স্ত্রী সকল সময়ই চান তার স্বামী তাকে গৃহ কাজে সাহায্য করুক। কিন্তু তিনি নিজের ছেলেকে কোনো কাজ করতে দেন না। অথচ এ ছেলেটিও একদিন স্বামী হবে এবং তার স্ত্রীও চাইবে তার স্বামী তাকে কাজে সাহায্য করুক, তখন কিন্তু ছেলে অপারগ হবে। কারণ তার মা তাকে সে ট্রেনিং দেননি। অনেক একান্নবর্তী পরিবারে স্বামী তার স্ত্রীর কাপড়চোপড় ধুয়ে দিলে মা কষ্ট পান, 'হায়! ছেলেটা বউয়ের নেওটা হয়ে পড়েছে।'

করোনা ভাইরাস আমাদের এ মূল্যবোধেও হাতুড়ি পেটাচ্ছে। 'বদলাতে হবে, বদলে দাও' –সমাজে পরিবর্তন আন। পরিবারে অধিকার ও সাম্য নারী-পুরুষ সকলের জন্যই আনতে হবে। পুরুষদের জন্য রান্নাঘরে এ কাজের অধিকার করে দিতে হবে। পুরুষরাও পারে। বাইরে অনেক অনেক কঠিন কাজ পুরুষরা করতে পারে আর রান্নাঘর ও ঘর সামলানোর কাজ পুরুষরা করতে পারবে না!

নারী এবং কন্যাশিশুদেরও মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। নারীরা মনে করে, পুরুষরা মজার মজার খাবার তৈরি করতে পারবে না। কিন্তু চিন্তাটা ভুল। বড়ো বড়ো হোটেল-রেস্টুরেন্টে এবং বিয়ে বাড়ির সুস্বাদু রান্নার বাবুর্চি কিন্তু পুরুষরাই। ছেলেশিশুকে তাই কন্যাশিশুর পাশাপাশি পেঁয়াজ কাটতে দিতে হবে। এতে পেঁয়াজের ঝাঁঝে চোখ দিয়ে তার পানি পড়তে থাকবে। তখনই বুঝবে পুরুষ শিশু, তার মাতা তার জন্য এমনি করে পেঁয়াজ কেটে কতইনা কেঁদেছে!

২০২০ সালের ৩রা মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা বলেছিলেন, 'ছেলেশিশুদের বড়ো করার প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন দরকার' (*প্রথম আলো*, ৪ঠা মার্চ ২০২০)। এ পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে বাবা-মাকে সমানভাবে, তবে মা'র ভূমিকাটা ছেলেসন্তানের জন্য অধিক উপযোগী ও বাস্তব। কারণ শিশু-সন্তান মা'র দিকেই তাকিয়ে থাকে। মায়ের ব্যক্তিত্ব ও সঞ্চালনা শিশুর বিকাশে খুব বেশি প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশ নারী ও শিশু বিষয়ে বিশ্বে অনেক ক্ষেত্রেই ঈর্ষণীয়ভাবে এগিয়েছে। কিন্তু শিশুর বিকাশের ধারণায় বাংলাদেশ বিশ্বে পিছিয়ে আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ও ল্যানসেট কমিশনের এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিশুদের বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশ খানিকটা পিছিয়ে আছে। (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় সাময়িকী ল্যানসেট পরিচালিত যৌথ কমিশনের এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে)।

এতে বোঝা যায়, বাংলাদেশে শিশুর বিকাশে প্রচলিত মূল্যবোধ ও কর্মধারায় কিছু দুর্বলতা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, সবকিছু আমাদের সরকার ও সংস্থাগুলো এসে করে দিয়ে যেতে পারবে না। আমাদেরটা আমাদেরই করতে হবে এবং অনেক কিছু এখনো পরিবারের নিত্যনৈমিত্তিক কার্যক্রম থেকেই শুরু করার দাবি রাখে। এখন এ কাজে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার কাজটা আমাকেই আগে করতে হবে। প্রত্যেকে, সে নারী অথবা পুরুষ যে-ই হোন, সকলেরই একযোগে কাজটি শুরু করে দিতে হবে। করোনা ভাইরাস যেন আমাদের অবরুদ্ধ করে সে কথাই বলে দিতে এসেছে। আমরা যেন কথাটি শুনি, কাজটি করি।

লেখক: গ্রন্থকার ও গবেষক

বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান 'জয় বাংলা'

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অনুপ্রেরণা জোগানো স্লোগান 'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণা করে চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। এটি ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয় স্লোগান। জাতীয় দিবস, সরকারি অনুষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'জয় বাংলা' স্লোগানটি উচ্চারণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আদালতের এ রায় বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিবেদন তিন মাসের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্টার জেনারেলের কাছে দাখিলের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দুই বছর আগে জারি করা রুল নিষ্পত্তি করে ২০২০ সালের ১০ই মার্চ বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের বেঞ্চ এ রায় দিয়েছেন। রায়ে আদালত বলেছেন, আমরা ঘোষণা করছি, 'জয় বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হবে। সব জাতীয় দিবসগুলোতে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাংবিধানিক পদাধিকারীগণ এবং রাষ্ট্রীয় সব কর্মকর্তা সরকারি অনুষ্ঠানের বক্তব্য শেষে 'জয় বাংলা' স্লোগান উচ্চারণ করেন। সেজন্য সংশ্লিষ্ট বিবাদীরা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

এছাড়া সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অ্যাসেম্বলি সমাপ্তির পর ছাত্র-শিক্ষকগণ 'জয় বাংলা' স্লোগান উচ্চারণ করেন সেজন্যও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আদালতে রিটের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী বশির আহমেদ। 'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণার নির্দেশনা চেয়ে ২০১৭ সালে হাইকোর্টে তিনি রিট করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ বি এম আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বাশার। এ দিন রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেছেন, জয় বাংলা জাতীয় ঐক্যের স্লোগান।

প্রতিবেদন: মোহাম্মদ হোসেন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক: স্বাধীনতা স্তম্ভ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

মুজিববর্ষের আলোকে আমাদের স্বাধীনতা

মিলন সব্যসাচী

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে যাঁরা স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের অন্যতম। তিনি মৃত্যুময় শ্মশানের নিস্তব্ধতা মাখা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও নির্ভীক সৈনিকের মতো বলেছিলেন– 'ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় বলব, আমি বাঙালি– বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ।' তাঁর বিপ্লবী বাসনা জাগ্রত চেতনায় বিশ্বদরবারে বীর বাঙালি উন্নতশিরে দাঁড়াবার প্রেরণা পেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে সাতই মার্চের মর্মস্পর্শী মহাকাব্যিক ভাষণ এবং সীমাহীন সাহসী সংগ্রাম স্বজাতি ও স্বভূমিকে দিয়েছে হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি এবং বিশ্ব বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা হিসেবে সাহসে, সংগ্রামে শীর্ষবিন্দু স্পর্শের গৌরব অর্জনে মানব জনম ধন্য। মুক্তিকামী মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়ে এবং শেকড় সন্ধানী ইতিহাসের অমলিন অধ্যায়ে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিববর্ষ বরণে মুগ্ধ মুখর বিশ্ববাসী বিনম্র চিত্তের শ্রদ্ধায় অফুরন্ত ভালোবাসায় তাঁকে স্মরণ করবে অনন্তকাল।

১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উত্তাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই মহাকাব্য এবং রাজনীতির মহাকবিকে বাঙালি জাতি কোনো দিন ভুলবে না। পাপের রাজ্য রক্ষায় নিমগ্ন ঘৃণ্য-ঘাতক পাকসেনাদের অন্যায় অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যাযজ্ঞ, গণহত্যার বিরুদ্ধে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠা নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। উদাম পায়ে, অর্ধনগ্ন শরীরে অকুতোভয় বাঙালি সম্মিলিত নারী-পুরুষ মুক্তির মোহনা খুঁজতে হন্য হয়ে ওঠেছিল। দল-মত-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে বুকের সাহসটুকু সম্বল করে প্রতিরোধ প্রতিশোধের দুর্গ গড়ে হাতে তুলে নিয়েছিল গোলা, বারুদ ও রাইফেল। ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'– স্লোগানের মাধ্যমে শত্রুসেনার বুকে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। পঁচিশে মার্চ কালরাতের ভয়ংকর গণহত্যা বাঙালিদের রক্তে অপ্রতিরোধ্য আগুনের লেলিহানশিখা জ্বেলে দিয়েছিল। বাঙালিরা চেয়েছিল স্বাধীন স্বপ্নীল জীবন না হয় শহিদি মরণ। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিদগ্ধ দিনে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছিল। নর ঘাতকরা কেড়ে নিয়েছিল দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম। এমন ঘৃণিত কর্মকাণ্ডে পাকসেনাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের পদলেহী দোসর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দেশদ্রোহী– শত্রুসংঘ আলবদর, আলশামস, রাজাকারসহ বাংলার কিছু কুসন্তান। যাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে, ধর্ষণে, হত্যাযজ্ঞে এ ভূখণ্ড পরিণত হয়েছিল নরকে। বন্যপশুর হিংস্রতায় যারা স্তম্ভিত করেছিল দেশপ্রেমী মানুষকে। তবু তারা অদম্য গতিতে ছুটে চলছিল স্বাধীনতার সূর্যটাকে হাতের মুঠোয় ছিনিয়ে আনতে। নদীর প্রতিকূলে প্রবল অশ্রুস্রোতে শক্তহাতে ধরেছিল হাল। সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রত্যাশিত স্বপ্নতরীর কর্ণধার ছিলেন শেখ মুজিব।

পাকিস্তানের জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের প্রাচীর ভেঙে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ করে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা পেয়েছি শত জনমের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন বাংলাদেশ। মুক্তিসেনাদের মুখোমুখি যুদ্ধে পরাজিত পাকসেনারা নেড়ি কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালালেও থেমে থাকেনি কুচক্রিদের ষড়যন্ত্র। তারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও বাঙালিদের অর্জন ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্যপ্রয়াসে লিপ্ত। পরিকল্পিত নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মধ্যরাতে দিকভ্রান্ত কতিপয় সৈনিক নির্মমভাবে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল।

একই বছর ৩রা নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান চারস্তম্ভ জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে কারাগারে হত্যা করেছিল। হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল– মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার সমাধি রচনা করা। এমন ঘটনার প্রেক্ষাপটে মৃত্যুর মহোৎসবে যারা মগ্ন মাতালের মতো উদ্‌বাহু নৃত্যে মেতে উঠেছিল সেই সব নব্য মীর জাফরদের মুখোশ খুলে দিয়েছিল ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি। সচেতন জনতার দৃষ্টিতে চিহ্নিত হলেও তারা অপকৌশলে দীর্ঘদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল। তারা মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস প্রচার করে। এমনকি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের যে অবিস্মরণীয় অবদান পাকিস্তানপন্থিরা তা অস্বীকার করে। এ অপশক্তির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুকন্যা 'মাদার অব হিউম্যানিটি' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উন্নয়নের যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে আছে কোটি কোটি জাগ্রত জনতা। বঙ্গবন্ধুর আমৃত্যু সংগ্রামের সোনালি ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দি বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাস বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের মানচিত্র। এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়েছে। এসব রাজ্যে মাঝে মাঝে বহিরাগত শোষকরা আক্রমণ চালিয়েছে। বারবার সীমান্ত পরিবর্তনের কারণে বাঙালিদের রাজনৈতিক আনুগত্য বিকাশ সাধিত হয়নি। বাঙালির সমষ্টিগত চেতনার অভাব ছিল। বাঙালি চিন্তাবিদ স্বাধীনতার দর্শন, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওসেতুবাদ, সুফিবাদ ও ইউরোপীয় মতবাদ ও পৌরাণিক ইতিহাস বৃত্তান্ত চর্চায় নিমগ্ন অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনসত্তা, জাতিসত্তা ও স্বাধীনতা কেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য চিন্তাভাবনার গহীন অরণ্যে প্রবেশ করে অধ্যয়নে বৈরাগ্যভাব। যেন সহজ শর্তে স্বর্গ প্রাপ্তির তাচ্ছিলতায় আচ্ছন্ন প্রায় সকলে। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ হাতেগোনা কয়েকজন ব্যক্তি বাঙালিদের স্বার্থের কথা বললেও পরাধীন বাঙালির স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তেমন উঁচু কণ্ঠে কেউ কিছু বলেননি। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে তখন ইউরোপীয় চিন্তাধারার স্রোতে প্রবহমান ছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্বতন্ত্র স্বাধীন ও স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালি জাতি বা রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেননি। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম সাহিত্যিক দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে যিনি স্বাধীনতার পক্ষে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর 'ভাঙার গান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'পূর্ণ অভিনন্দন' কবিতার একাংশে তিনি উল্লেখ করেছেন– 'জয় বাংলা' তাঁর বিদ্রোহী হৃদয়নিসৃত এই উচ্চারণের অনুগত্য ছিল অমলিন। বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রশ্নে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বাঙালির পেট্রিয়টিজম'-এ ভারতের ভূমিকাকে সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন যে, 'ইউরোপের কোনো জাতির সঙ্গে অপর জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে' অপর জাতির যে প্রভেদ রয়েছে।'

১৯২৭ সালে নিখাঁদ স্বতন্ত্র বাঙালি রাষ্ট্র গঠনের কথা না বলে এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রশ্ন করেছিলেন 'ভৌগোলিক ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও রাজ্য গঠনের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কি শুধু ভারতবর্ষে বিফল বলিয়া প্রমাণিত হইবে? এস ওয়াজেদ আলী তাঁর 'ভবিষ্যতের বাঙালি' গ্রন্থে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা স্বাধীনের সবচেয়ে নিকটবর্তী কিছু বক্তব্য দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের আগেই বঙ্গপ্রদেশের রোগাক্রান্ত শীর্ণ শরীর দ্বি-খণ্ডিত হয়েছিল। বৃহত্তর বঙ্গের প্রতি বাঙালিদের আন্তরিকতার জন্য তৎকালীন হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ব্রিটেনের সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় স্বাধীনতা শব্দটি লেখা হলেও সে স্বাধীনতা বাংলার স্বাধীনতা নয়। বাংলায় স্বাধীনতার কথা ইতঃপূর্বে কেউ কখনো উচ্চারণ করেননি। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় প্রত্যক্ষ ইতিহাস বঙ্গবন্ধুকে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনায় খুব বেশি পীড়িত করেছিল বলেই তখন থেকে তিনি বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখার সূচনা করেন। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের জনক জিন্নাহ'র নেতৃতে ধর্ম ও সম্প্রদায় কেন্দ্রিক ভাবনানির্ভর এক রক্তস্নাত ইতিহাসের রক্তাক্ত পথের শেষান্তে জন্ম হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের। গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ওপর সংখ্যা লঘিষ্ঠ উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিয়েছিল। বিভিন্ন দিক দিয়ে এভাবেই শোষণভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার অপচেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠেছিল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে চরম ঘৃণার জন্ম দিয়েছিল। পাকিস্তানের চক্রান্ত রুখে দিতে ভাষা আন্দোলনে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল। বাংলা মায়ের কৃতী সন্তান রফিক, শফিক, সালাম, বরকত এবং নাম না জানা আরো অনেক দামাল ছেলেরা। আজন্ম ভাষাপ্রেমী শেখ মুজিব তখন কারাগারে বন্দি ছিলেন। ১৯৪৭ সাল থেকে বাঙালিদের মনে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠলেও মূলত ভাষা আন্দোলন থেকেই বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ সুগম হয়ে উঠেছিল। ১৯৫২ সালের রক্তাক্ত রাজপথ বাঙালি জাতিকে দিয়েছে ১৯৭১-এর আলোকিত স্বাধীন স্বদেশ আর মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তিম অশ্রুসিক্ত প্রিয় স্বাধীনতা। সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিব এ জাতিকে দিয়েছেন স্বাধীনতার অমৃত স্বাদ।

১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে তাঁর ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন। একই বছর ১২ই ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছিল। ১০ই মার্চে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বলেন, এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগে চাপাচাপি করলে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়া হবে এবং দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আইন ও পার্লামেন্টারি দপ্তরের মন্ত্রী আবদুল হাই চৌধুরী ৬ দফাকে দেশদ্রোহিতার নামান্তর বলে অভিহিত করেছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সব দুর্ঘটনা অবাঙালি আমলা, পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানের প্রেতাত্মাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হয়েছে।

১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বায়ত্তশাসনের জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। যে কারণে তারা আবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর ডাকে শুরু হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল আমূল পরিবর্তন প্রত্যাশী বাংলার যুবসমাজ ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠে রণধ্বনি তুলেছিল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা', 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ইত্যাদি। বাঙালি জাতির এই প্রাণের দাবি ভুট্টো সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ তিনি বলেছিলেন– 'ওদের দাবি তো স্বাধীনতার চেয়ে বেশি প্রায় সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি। সামরিক জান্তাও বুঝতে বিন্দুমাত্র ভুল করেনি। ২৫শে মার্চ রাতে তারা বাংলাকে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করেছিল– যেখানেই স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হতো। তবুও থমকে দিতে পারেনি বীর বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুক্তিসেনারা ও মিত্রসেনারা পাকসেনাদের পরাস্ত করে। তারা ব্যর্থ হয়ে অবশেষে মেনে নেয়েছিল পরাজয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার হয়ত জন্ম হতো না ক্ষণজন্মা মহান নেতা শেখ মুজিবের জন্ম না হলে। দেশাত্মবোধের দিশারী জাতির পিতার জন্মশতবর্ষের অনাবিল আলোয় ভরে উঠুক সকল আঁধারাচ্ছন্ন আঙিনা। 'জয় বাংলা'।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও বঙ্গবন্ধু গবেষক

দেশে দেশে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

মোহাম্মদ খালিদ হোসেন

১৭ই মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী থেকে ১৭ই মার্চ ২০২১ সাল পর্যন্ত মুজিববর্ষ উদ্‌যাপিত হবে। এলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ যথাযথ মর্যাদায় মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

কানাডার এডমন্টন পাবলিক লাইব্রেরিতে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

কানাডার এডমন্টনে 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' নামের সংগঠন মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের ঘোষণা দিয়েছে। ৪ঠা মার্চ সংগঠনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে

নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ মিশনে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ১৭ই মার্চ সন্ধ্যায় এডমন্টন পাবলিক লাইব্রেরিতে (ক্লেয়ারভিউ) এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে কানাডার পার্লামেন্ট সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তা ও গণমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নামে কৃষি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করবে কানাডা। কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটিতে (জিআইএফএস) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে (বিএআরসি) বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপন করবে। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নামে পিয়েরি এলিয়ট ট্রুডো একটি আধুনিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করবে।

জিআইএফএস এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) টেকসই নিরাপদ খাবারের উন্নয়নে সহায়তার জন্য গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বিকাশের অংশীদারিত্বের কাজ করতে সম্মত হয়েছে উভয় দেশ। এরই ধারাবাহিকতায় কানাডা এবং বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা চুক্তিতে (এমওইউ) স্বাক্ষর করেন বিএআরসি-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এবং কানাডার জিআইএফএসের চিফ অপারেটিং অফিসার স্টিভ ভিসার। ২রা মার্চ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। বর্তমান সরকারও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। কৃষি ও কৃষকের জন্য বর্তমান সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

সাসকাচোয়ান কৃষিমন্ত্রী ডেভিড মেরিট তার সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার।

ওয়াশিংটনে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করার ঘোষণা দিয়েছে। ২রা মার্চ শহরটির মেয়র মুরিয়েল বার্ডসার এ ঘোষণা দেন। ঘোষণা অনুযায়ী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করছে ওয়াশিংটন ডিসি। এই বিশেষ বর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র মুরিয়েল বার্ডসার। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক, সহিষ্ণু, বহুদলীয় ও মধ্যপন্থি দেশ হিসেবে বৈশ্বিক উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে ঘোষণাপত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর বলেছে, দেশটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তর ও বিকশিত হচ্ছে। ঘোষণায় আরো বলা হয়, ওয়াশিংটন ডিসির সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে বাংলাদেশ দূতাবাস অবদান রাখছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকরা যথাযথ মর্যাদায় মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে নানান কর্মসূচি পালন করছে। ১৭ই মার্চ জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচি পালন ও উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

ইস্তাম্বুলে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত

বাংলাদেশ কনস্যুলেট ইস্তাম্বুল যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ৭ই মার্চ কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন করে। এ দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি 'বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও প্রবাসীদের ভূমিকা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনার শুরুতে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে ৭ই মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধুর এ কালজয়ী ভাষণটি আজ বিশ্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। UNESCO এ ভাষণটিকে World's Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়েছে, যা জাতি হিসেবে আমাদেরকে করেছে গর্বিত ও আনন্দিত। এ দিবসটি আজ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে কারণ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে সরকার মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আলোচনার প্রারম্ভে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের কালজয়ী ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই মার্চ ২০২০ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস
এগিয়ে চলেছে নারী

ইফফাত রেজা

'প্রজন্ম হোক সমতার সকল নারীর অধিকার'– প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদ্‌যাপিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সাথে জড়িয়ে আছে বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার। ক্ষমতায়ন ও সমতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন আন্দোলন ও লড়াইয়ের ইতিহাস। তাই নারী উন্নয়ন শব্দটি আজকের দিনে বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। এই শব্দটিতে রয়েছে বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা ও ব্যাপ্তি। আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে নারী। পরিবার থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে নারীর অবদান ও অংশগ্রহণে নারী অবহেলিত ও অস্বীকৃত। ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আদিকাল থেকেই নারী তার ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়াই করে এসেছে। সম্পদ, রাষ্ট্র, দক্ষতা, উচ্চশিক্ষা, জীবিকা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এই সবক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় নারী পিছিয়ে রয়েছে। নারী পুরুষের সমান সুযোগ, অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করা এখনো সমাজের এক বড়ো চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি অনেক। কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতা এই অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে। 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম' (ডব্লিউইএফ)-এর এক বৈশ্বিক বৈষম্যের প্রতিবেদনে নারী পুরুষের ক্ষমতার দিক পর্যবেক্ষণে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের ওপর স্থান পায় বাংলাদেশ। এছাড়া লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের সাবেক শিক্ষক ক্রোজ তার 'ঝোলাওয়ালা অর্থনীতি ও কাণ্ডজ্ঞান' বইতে বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন। তিনি তার বইতে লেখেন, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে। লিঙ্গ বৈষম্যের অন্যান্য সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে নারীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতির সঙ্গে বেড়েছে নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দ। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৭ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। বিশ্ব নারী দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, 'আমরা জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই মার্চ ২০২০ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'জয়িতা সম্মাননা' প্রাপ্তদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন–পিআইডি

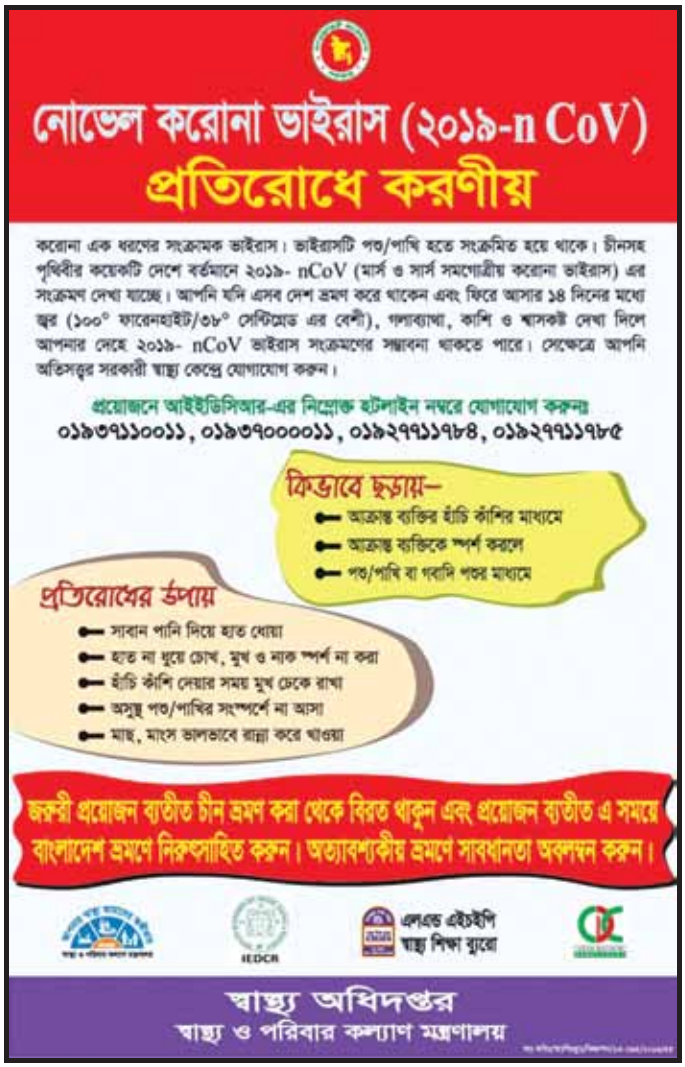

পুরুষের পাশাপাশি নারীকে সহযাত্রী করেছি। নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১'। নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ নীতিমালা ২০১৮। নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর দারিদ্র্যবিমোচন, বাল্যবিবাহ নিরোধ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি স্বেতনে ৬ মাস উন্নীতকরণ এবং মাতৃত্বকালীন ভাতা ও ল্যাকটেটিং মাদারভাতা চালু করেছি। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, বিধবা-তালাকপ্রাপ্ত ও নির্যাতিত নারীদের ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা চালু করা হয়েছে। নারী নির্যাতনে প্রতিরোধে জেলা উপজেলায় ৬৭টি ওয়ান- স্টপ ক্রাইসিস সেল ও ন্যাশনাল হেল্প লাইন ১০৯ চালু করা হয়েছে। ভিজিএফ, ভিজিডি ও জিআর কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমেও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে রাজনীতি, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, সশস্ত্র বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সবক্ষেত্রে নারী যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নে রোল মডেল।

আজ বিশ্বের অনেক দেশেই অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী নিজ নিজ দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। এর মূল কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও মানসিকতা। ফলে পরিবার থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নারীর অবদান ও অংশগ্রহণ থাকছে অবহেলিত ও অস্বীকৃত। তবে এর পাশাপাশি অনেক দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর এগিয়ে আসার জন্য গৃহীত হচ্ছে বিভিন্ন কৌশল ও নীতি। কেবল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেই নয়, বাংলাদেশও এখন তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জন করে বাংলাদেশ এখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার একটি অন্যতম ধারা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। চার দফায় প্রধানমন্ত্রী এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদের স্পিকার পদে পরপর দুই মেয়াদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন একজন নারী। সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিটি ইউনিটে ও উচ্চ পদে রয়েছে নারী। প্রশাসনে সচিব, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিচারপতি সব পদেই নারী অধিষ্ঠিত। বিজিএমইএ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো একজন নারীকে আমরা প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে পাই। এসব অর্জন প্রমাণ করে নারীর ক্ষমতায়ন। ক্ষমতার উৎস কাঠামোগত পরিবর্তন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে ঘটেছে এসব ইতিবাচক দিক। বাংলাদেশে পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তি– যা বদলে দিয়েছে সারা দেশের নারীর সামাজিক চিত্র। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রথমবারের মতো নারীরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। ফলে নারীর জীবন ও সমাজ ব্যবস্থায় ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন। দারিদ্র্য, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার গ্রামের নারীদের পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল করে রেখেছিল। জীবন আর জীবিকার তাগিদে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে মানোবল আর সহজাত দক্ষতায় পোশাকশিল্পে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিতে পেরেছিল বলেই পরবর্তীতে তৃণমূল পর্যায়ে অন্যান্য পেশাতেও নারীকে কর্মরত দেখার মানসিকতা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে নারী শ্রমিকদের বৈষম্য কমে এসেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, শহরে বা গ্রামে নারীরা নির্মাণ-শ্রমিকের কাজ করছে। আত্মকর্মসংস্থান মূলক কার্যক্রম নারীর কাজের পরিধিকে করছে বিস্তৃত। তৃণমূল পর্যায়ে নারী এখন স্থানীয় সরকারের ইউপি সদস্য; ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টরে তথ্যপ্রযুক্তিতে নাগরিক সেবা প্রদানকারী হিসেবে সহজভাবে গ্রহণ করায় বদলে গেছে সমাজে নারীর পরিচয়। পরিবারে নারী আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয়। নারীদের মধ্যে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। বিশ্ব নারী দিবসের এক অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুননেসা ইন্দিরা বলেন– নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন, জাতীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, শ্রমবাজারে প্রবেশগম্যতা বাড়ানো এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। শতবাধায় আজ নারী এগিয়ে যাচ্ছে। এইসব হেরে না যাওয়া, লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে না যাওয়া নারীদের শ্রদ্ধা জানাই।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৭ই মার্চ ২০২০ তথ্য ভবন মিলনায়তনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিষয়ক আলোচনাসভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এ সময় তথ্যসচিব কামরুন নাহার উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণকারীদের ডিএফপি'র সম্মাননা প্রদান

জে আর লিপি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণ, প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংরক্ষণ ও বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি অর্জনের গর্বিত অংশীদার চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) থেকে ডিএফপি'র নিজস্ব ক্যামেরায় যাঁরা এই ঐতিহাসিক ভাষণটি ধারণ এবং রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এটি সংরক্ষণ করেছিলেন তাঁদের সম্মাননা প্রদান করেছে ডিএফপি। ৭ই মার্চ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের তথ্য ভবন মিলনায়তনে ঐতিহাসিক এই দিবস উপলক্ষে ডিএফপি আয়োজিত আলোচনাসভা ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্যসচিব কামরুন নাহার। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীন, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকার, ডিএফপি'র সাবেক মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন ও সদ্য বিদায়ী মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনসহ তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণে বিশেষ অবদান রাখায় ডিএফপি'র যে আটজন সম্মাননা পেলেন তাঁরা হলেন– আবুল খায়ের মোহাম্মদ মহিব্বুর রহমান (মৃত)-চিফ ক্যামেরা ডিভিশন, জি. জেড. এম .এ. মবিন (মৃত)-ক্যামেরাম্যান, এম. এ. রউফ (মৃত)-ক্যামেরাম্যান, আমজাদ আলী খন্দকার-ক্যামেরা সহকারী, এস. এম. তৌহিদ (মৃত)-ক্যামেরা সহকারী, সৈয়দ মইনুল আহসান-ক্যামেরা সহকারী, মো. হাবিব চোকদার (মৃত)-লাইটবয়, মো. জোনায়েদ আলী মৃত-লাইটবয়।

অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ৭ই মার্চ কোনো দলের নয়, এটি সমগ্র জাতির। সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ করে জাতিসংঘের ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম

ফটোফিচার: মোঃ ফরিদ হোসেন

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৭ই মার্চ ২০২০ তথ্য ভবন মিলনায়তনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ধারকদলের সদস্য আমজাদ আলী খন্দকারের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। এ সময় তথ্যসচিব কামরুন নাহার উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে, স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই ৭ই মার্চের ভাষণকে বিএনপিসহ কিছু গোষ্ঠী স্বীকৃতি দিতে পারে নাই, ৭ই মার্চ পালন না করা প্রকারান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামকেই অস্বীকার করার শামিল।

তথ্যসচিব কামরুন নাহার বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী যখন সমাগত, আজ ৭ই মার্চের এই দিনে দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলাই হোক আমাদের শপথ।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার দিক নির্দেশনামূলক ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক এ ভাষণ কীভাবে ডিএফপি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেদিন ধারণ করেছিলেন, ১৯৭১-এ হানাদার বাহিনীর হাত থেকে এবং ১৯৭৫ পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যে কীভাবে এটিকে রক্ষা করেছিলেন এবং বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনে ডিএফপি'র ভূমিকাও যে গুরুত্বপূর্ণ– তা বিশেষভাবে উঠে আসে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তাদের বক্তব্যে। অনুষ্ঠানের স্মৃতিচারণামূলক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ক্যামেরায় ধারণকারী আমজাদ আলী খন্দকার ও সৈয়দ মইনুল আহসান।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ৭ই মার্চ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভা, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এ অধিদপ্তরের পরিচালক/সিনিয়র সম্পাদক এম কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন এ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সায়েম হোসেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়ার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৭ই মার্চ ২০২০ তথ্য ভবন মিলনায়তনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ধারকদলের সদস্য সৈয়দ মইনুল আহসানের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। এ সময় তথ্যসচিব কামরুন নাহার উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

লেখক: প্রাবন্ধিক

নববর্ষের সর্বজনীনতা

শাফিকুর রাহী

বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উৎসব। এ শুভ দিনে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ– সব ধরনের ধর্ম-জাতি-বর্ণনির্বিশেষে সর্বস্তরের গণমানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্প্রীতির মহাবন্ধনে আলিঙ্গন করেন আনন্দের জয়ধ্বনিকে। সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ এক কাতারে সামিল হয়ে তারা জানান দেয় বাঙালির মহা আনন্দঘন প্রাণের উৎসবকে। সমগ্র বাঙালির এ এক মহামিলনের সর্বজনীন উৎসব। এখানে ছোটো-বড়ো ভেদাভেদহীন এক অনাবিল আনন্দে মানুষ মেতে ওঠে আপন মনে। বাঙালির হাজার বছরের লালিত ইতিহাস ঐতিহ্যের এক অনন্য দিন পহেলা বৈশাখ। এ গণ-আনন্দের দিনকে সামনে রেখে বাংলার চিরায়ত বৈশাখি মেলার আয়োজন শহর-নগর ছেড়ে অজো পাড়াপল্লির আকাশে বাতাসেও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়– এসো হে বৈশাখ, এসো এসো, কিংবা ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়। তোরা সব জয়ধ্বনি কর! সারাবছরের সকল ক্লান্তি ঝেড়ে নতুনের দারুণ প্রত্যাশায় ছোটোবড়ো সবার মুখে ফুটে ওঠে অবিস্মরণীয় এক আনন্দ হাসি।

যে আনন্দের জোয়ারে হারিয়ে যেতে চায় দুরন্ত কিশোর থেকে আশি বছরের বৃদ্ধ, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। বিশেষ করে রমনার বটমূলে যেভাবে লাখো লাখো মানুষের বাধভাঙা জোয়ারে ভেসে বেড়ায় আপন ঠিকানা, ভীষণ উল্লোসিত মনে। গ্রামের পহেলা বৈশাখ আর শহরের পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের ভিন্ন মাত্রা যোগ হয় নানাভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে। শহরে বস্তিঘর থেকে শুরু করে বিশাল অট্টালিকায় একই আয়োজন করে বেশি কিংবা কম এই যা পার্থক্য, সবার ঘরেই এই শুভ নববর্ষের আয়োজন হয় ধুমধাম করে। এ যে কী আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়? ছোটোবড়ো সবার মুখে হাসি ফোটে এক অনাবিল আনন্দে।

কোথাও বসে মেলা আর কোথাও নাচগানের আসর, কোথাও নাগরদোলায় দুলতে দুলতে সকাল থেকে সন্ধ্যা গড়ালেও ঘরে ফেরার যেন তাড়া নেই। বিশেষ করে পহেলা বৈশাখে নতুনের জয়গানে আনন্দ আসরে। পহেলা বৈশাখের আনন্দের ছবি এঁকেছেন আমাদের চিত্রকর তাদের তুলির ছোঁয়ায়, কবির গানে, কবিতায় পেয়েছে নানা মাত্রা। এত আনন্দের মাঝেও বৈশাখ এলেই গ্রামগঞ্জের মানুষের আবার শঙ্কাও বাড়ে কারণ এই মাসেই ঘূর্ণিঝড় থাবা হানে কালবৈশাখি ঝড় নামে। আসলে এটা প্রকৃতির এক ধরনের প্রতিবাদী রূপের বহিঃপ্রকাশ বলা যায়।

বৈশাখের প্রলয়ংকরী ঝড়ের রূপবর্ণনা এভাবেই ফুটে ওঠে কবির কবিতায়: কালবোশেখের কালচে আকাশ হঠাৎ যেন ঝলকায়/ উঠোন বাড়ি উথালপাথাল– মেঘ বিজুলি ছলকায়/ পাগলা ঝড়ের নৃত্যে ওড়ে হাড়ি পাতিল ডেকচি। বাঙালির নববর্ষ পহেলা বৈশাখ এক সর্বজনীন উৎসব হিসেবে সর্বমহলে যেভাবে আন্দোলিত ও আলোড়িত হয়ে আসছে তা সত্যি মহাআনন্দের ও খুশির সংবাদ। এইভাবে কালে কালে যুগে যুগে বাংলার নববর্ষকে নিয়ে বাঙালি কবিরা অসংখ্য কবিতা, গান লিখেছেন বৈশাখের ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে কবির উচ্চারণ: নারী শিশু হত্যা করে করছে যারা উল্লাস/পারিস যদি তাদের গড়া স্বর্গ থেকে তুল লাশ/অসহায়ের অন্ন কেড়ে পাস কি মনে শান্তি/অট্টালিকা ভাঙতে কেন হয়রে এমন ভ্রান্তি/পারিস নাতো বড়ো লোকের একটি পশম নাড়তে/পারিস শুধু না খাওয়াদের স্বপ্নটুকু কাড়তে। এভাবেই বৈশাখের ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে কবিরা কবিতা লিখে প্রতিবাদ জানিয়েছেন নানাভাবে নানা আঙ্গিকে।

যে অনন্ত আনন্দঘন দিনটি বরণের জন্য সমগ্র বাঙালি কী এক অলৌকিক মন্ত্রটানে পুরোনো সব দুঃখগ্লানি ভুলে ঘর ছেড়ে ছোটো বড়ো সবাই মিলে দলে দলে বেরিয়ে পড়ে উল্লোসিত মনে। পাগলা হাওয়ায় গানের তালে প্রাণে-প্রাণে লাগল দোলা বইল খুশি আনন্দবান। সবাই যেখানে একই রথের অভিযাত্রী। শহর-নগর অজো পাড়ায় লাখো মানুষ ফেটে পড়ে গানের সুরে, অন্তঃপুরে তবলা-ঢোলক বাজে। কোথাও কোনো নেইতো বাধা প্রাণের টানে ছুটছে মানুষ বাঁধনহারা হাসিখুশি মহানন্দে। বৈশাখ সম্প্রীতির মহান সেতুবন্ধনে আবাহন করে বাঙালিকে। সর্বোপরি-বৈশাখের কাছে বাঙালি জাতির ঋণও অপরিসীম।

এই বৈশাখেই জন্মেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং জগতখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়। কে জানে বাংলার আরো কত মহা মনীষীই না এই ঝড়ক্ষুব্ধ বৈশাখেই বাংলা জননীকে ধন্য করেছেন। সেই সব মহামনীষীকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে পহেলা বৈশাখের শুভ কামনায় আমাদের পথচলা। আমরা সুখে-দুখে-আনন্দ-বেদনায় বঙ্গজননীর কল্যাণ ভাবনায় নিজেদেরও ভাগ্যবান বলে গর্ববোধ করি। বাঙালি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে সভ্যতার সোপান বিনির্মাণে।

কত না সৌখিন নগরবাসীর হৃদয়ের তারে বেজে ওঠে 'তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে' কিংবা 'তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে'। এই শুভদিনের ব্যাকুল আবাহনে মেতে ওঠে আপন টানে বাঙালির মনোমাঠ। আমাদের প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। এই পূর্ণ দিবসেই বাঙালি জাতি স্বপ্ন দেখেন আলোকিত আগামীর সব মানুষের কল্যাণীয় পথচলার। বলা হয়, বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। তারপরও বলতে হয়, বাঙালি জাতির যে উৎসব ও উল্লাসের পবিত্র সূর্য ডানা মেলে সুপ্রভাতে তারই নাম বাংলা নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষকে ভালোবেসে কবি যখন কবিতা লিখেন– মাল্লা-মাঝির ভাটিয়ালি সুখের পানসি নায়/এক তারাতে উদাস

বাউল মনের সুখে গায়/ঝিঁঝি পোকা বাজায় বাঁশি হাওয়ার তালে তালে/ঝুমুর ঝুমুর শব্দে নূপুর বাজে টিনের চালে। বাঙালির মহান ইতিহাস ঐতিহ্যের গৌরবগাথা বিরাজমান বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের ভেতর।

অবশ্য আমাদের জাতীয় জীবনে আনন্দ বেদনার গৌরবের শোকের কান্নাভেজা বিজয়ের বেশকিছু দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা হয় অতি গুরুত্বের সঙ্গে। এসব কিছুর ভেতরও পহেলা বৈশাখ কেন যেন সব থেকে আলাদা ও ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। এ অনন্ত উৎসবের ব্যাপকতা এতটাই বিস্তর ও বিকশিত তা অন্য কোনো পার্বণে কিংবা জাতীয় দিবসে আমরা দেখতে পাই না। এ এক বিরল আনন্দের দিন, বাঙালির আত্মপরিচয়ের দিন, এ দিনে জাতির প্রতিটা ক্ষেত্রে মর্মে-মর্মে গ্রামীণ জনপদে হালখাতার আমেজও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা সনের এই নতুন গণনার দিন পহেলা বৈশাখ। যার শুরুটা ঝড়ক্ষুব্ধ-আকাশে বজ্রপাতের ভয়ংকরী তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে হলেও এর যে মূল সুর বাজতে থাকে মঙ্গল শোভাযাত্রার সূচনা সংগীতের মনকাড়া তালে।

আমরা বহুকাল ধরেই মহানন্দে গ্রহণ করে আসছি হাজারো লোকঐতিহ্যের আনন্দ-আসরে নতুন বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখকে। কবির কবিতায় আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ : তপ্ত আকাশ, কালো মেঘে হঠাৎ গর্জে ওঠে/পুরানো সব কষ্ট ঝেড়ে নতুন গোলাপ ফোটে/গঞ্জে-গ্রামে, শহর জুড়ে, বসে বোশেখ মেলা/বর্ষবরণ গল্পে আছে, দারুণ লাঠি খেলা/ হাওয়ার তালে নাগরদোলায় কাড়ে সবার ঘুম/এই বোশেখের দমকা হাওয়ায় আম কুড়ানোর ধুম।

নানা সংকটেও দেখি আজো আমাদের প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখকে বরণে লাখো মানুষ মুখরিত হয়ে ওঠে আপন আত্মার মহিমান্বিত টানে। ফলে হতাশার কালো অমানিশার ভয়ার্ত থাবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আলোকিত আগামীর স্বপ্ন দেখে বীর বাঙালি। স্বপ্ন দেখে সত্য ও সুন্দরের জয়গান গেয়ে প্রাণ খুলে বাঁচার। পহেলা বৈশাখ সুখ আনন্দের নতুন আলোর বার্তা বহন করে আনবে অতীতের সব দুঃখ জরা গ্লানি মুছে ফেলে।

অমন শুভ শপথের ভেতর দিয়ে আমরা এগিয়ে যাব আগামীকে জয় করার লক্ষ্যে। বাঙালির বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত একটি জাতিগোষ্ঠী, যা বিশ্বে কোনো দেশ বা জাতির নেই বললেই চলে। গ্রামীণ জীবনে বাংলা নববর্ষের অফুরন্ত আনন্দের মরমীয় সংগীত বেজে ওঠে সকল প্রাণে সমান সুরে। অমন মধুর সময় যখন দূর থেকে ভেসে আসে প্রাণ হরণের মোহন সুর 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা' কিংবা 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি'। এ এক অবিস্মরণীয় আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে সকল ধর্ম-বর্ণের সোহার্দ্য সম্প্রীতির মহানবন্ধনে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় কীভাবে জেগে ওঠে জন্মজননী আমার। বঙ্গমায়ের বীর মহিমায় মহিয়ান বিশ্বলোকালয় নানাভাবে নানা কারণে। বাংলার দু'হাজার বছরের লোকঐতিহ্যের এক বিরল জড়োয়া সম্ভার যা দুনিয়ার খুব কম দেশেই আছে অমন লোকগাথা।

পহেলা বৈশাখ বাঙালির জাতীয় জীবনে শপথ ও স্বপ্নে প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে বৈষম্যহীন সমঅধিকারের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের মাধ্যমে বাঙালি এগিয়ে যাবে তার ইপ্সিত লক্ষ্যে। সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে সফল উদ্যোগ গ্রহণের সাথে সাথে মনোনিবেশ করতে হবে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে। এগিয়ে আসতে হবে সব ভেদাভেদ ভুলে আমাদের আগামী প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যতের কল্যাণকামী সোপান রচনায়। আকাঙ্ক্ষার আলোতে ভেসে উঠবে পুবাকাশে পহেলা বৈশাখের সোনালি সূর্য। যার তেজদীপ্ত আলোতে কেটে যাবে আঁধারের ভয়ার্ত অমানিশা, নতুন আলোয় আলোকিত আগামীর পথচলায় যোগ হবে সৃজনশীল কর্মপরিকল্পনা আর যোগ্যতার ভিত্তিতে হবে সম্পদের সুষমবণ্টন। নির্মিত হবে নির্বিরোধ বাধাহীন উজ্জ্বল সম্ভাবনার সফল বাংলাদেশ।

পহেলা বৈশাখ তো বাঙালির মননে অমন স্বপ্নজাগানিয়া বার্তা বহন করে। আলোর সন্ধানে আমরা আঁধারে দিয়েছি পাড়ি, এ অপরিসীম আলোর দীপ্তিতে অশুভ আঁধার পরাজিত হবে। বীর বাঙালির হাজার বছরের মহিমান্বিত ইতিহাস পহেলা বৈশাখের আগমনী জয়োগানে নেচে ওঠে দশদিগন্ত। মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির আখ্যান রচিত হয়ে আসছে কালকালান্তরে। গণমানুষের অংশগ্রহণে অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের আগামী প্রজন্ম– বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় সফল হবে এ দৃঢ় বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে অমলিন পুষ্পহাসিতে রাখালের বাঁশিতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত শান্তি সুখের মানবিক সুর বেজে উঠবে বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। বৈশাখের মাঙ্গলীয় সুর সুধায় বীর বাঙালি হবে জাগ্রত উদ্দীপ্ত– সে প্রত্যাশায় শুভ নববর্ষে সকলের মঙ্গল কামনায়।

লেখক: কবি, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, ক্ষুদ্রপ্রাণ মুজিব সৈনিক

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস

ফারিহা রেজা

বিশ্ব আবহওয়া দিবস প্রতিবছর ২৩শে মার্চ পালন করা হয়। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে– 'জলবায়ু ও পানি'। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালিত হচ্ছে। ১৯৫০ সালের এই দিনে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা গঠন করা হয়। পরের বছর ১৯৫১ সালে এটি জাতিসংঘের বিশ্ব সংস্থা হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে দিবসটিকে বিশ্ব আবহাওয়া দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। বর্তমানে ১৮৯টি দেশ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সদস্য। প্রতিবছর বাংলাদেশসহ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সব সদস্য রাষ্ট্র দিবসটি পালন করে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। দিবসটি উপলক্ষে পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। পানিচক্র পৃথিবী আবহাওয়া ও জলবায়ু ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই এবারের বিশ্ব আবহাওয়া দিবসের প্রতিপাদ্য 'জলবায়ু এবং পানি' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। পৃথিবীর যে-কোনো স্থানের আবহাওয়া এবং জলবায়ুর পূর্বাভাস ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া এবং জলবায়ুর তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক সহযোগিতা বিশেষ করে আন্তঃদেশীয় আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্যের আদান-প্রদান অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি মোকাবিলাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি উপশমে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আগাম ও সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। ঘূর্ণিঝড়, ভারীবর্ষণ, বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, তাপদাহ এবং খরাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি সুপেয় পানির স্বল্পতা বিশ্বব্যাপী মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের অবস্থানকে আরো ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। বাংলাদেশ ঋতুচক্রে বৈচিত্র্যময় দেশ। এখানে আবহাওয়ার গতি প্রকৃতির সাথে বিভিন্ন ধরনের ফল-ফসলের উৎপাদন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি আশা করি বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য তৃণমূল পর্যায়ে বিশেষত কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

দিবসটি উপলক্ষে পৃথক বাণী দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য আবহাওয়া এবং জলবায়ুর পূর্বাভাস প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দিতে বিএমডি অ্যাপস্ চালু করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে দশ দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদান করে কৃষি খাতে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আবহাওয়ার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক মডেল পরিচালনার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্লাস্টার কম্পিউটার ব্যবহার ও স্যাটেলাইট উপাত্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের সঠিক গতিপথ ও তীব্রতা নির্ণয়ে সফল হয়েছে।

আগাম পূর্বাভাস গ্রহণে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাণহানির ঘটনা এক সংখ্যায় নেমে এসেছে এবং জনপদের সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তাই আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা প্রদানে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে ইতোমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। আমি 'বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২০' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

লেখক: প্রাবন্ধিক

ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিতে হটলাইন ১৬১২১ চালু

ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিতে চালু হয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের 'ভোক্তা বাতায়ন' শীর্ষক হটলাইন সেবা। এ সেবায় কোনো ভোক্তা পণ্য বা সেবা ক্রয় করে প্রতারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করতে পারবেন ১৬১২১ নম্বরে। সপ্তাহের সাতদিন ২৪ ঘণ্টা এ সেবা চালু থাকবে। ১৫ই মার্চ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস-২০২০ উপলক্ষে আলোচনাসভা ও হটলাইন উদ্‌বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

এসময় তিনি বলেন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হতে হবে। এ হটলাইন চালুর মাধ্যমে ভোক্তার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনা যাবে। তিনি আরো বলেন, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হয়রানি করতে তৈরি করা হয়নি। আমরা চাই, যাতে কারো প্রতি এ আইনের প্রয়োগ করতে না হয়। ভোক্তা অধিকার বঞ্চিত হলে ভোক্তা বাতায়ন হটলাইন ১৬১২১ নম্বরে ফোন করলেই প্রতিকার পাওয়া যাবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে গেছেন। দেশের অনেক মানুষের ভোক্তা অধিকার বিষয়ে ধারণা ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ভোক্তার অধিকার সুরক্ষিত করতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন পাস করেছেন। সরকার ভোক্তা ও বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিবেদন: জুয়েল মোমিন

মনীষীর কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু: শিক্ষা ভাবনা

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে ১৯৭৫ সালে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ভারতের মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬ সালে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে সিনেট ও সিন্ডিকেটের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি অধ্যাপক শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ কয়েকবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আমেরিকার সাউদার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকাশনা রয়েছে। তিনি বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ২০০৯ সালে বিজয় দিবস পদক লাভ করেন। শান্তি, অগ্রগতি, সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানের জন্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক সম্প্রতি স্পেনের মহামান্য রাজা হুয়ান কার্লোস কর্তৃক 'কমান্ডার অব দ্য অর্ডার অব দ্য সিভিল মেরিট' পদকে ভূষিত হন। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পক্ষে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা বিষয়ে অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্নমুখী জ্ঞান ও চিন্তার অধিকারী ছিলেন। আপনি একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম করে আমাদের একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ উপহার দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে টিকে থাকতে পারে না। তাই আমরা দেখি স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন প্রশাসনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তখন তিনি শিক্ষাব্যবস্থার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন কীভাবে তিনি তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন। তিনি বলেছেন, সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার মানুষ চাই। সোনার মানুষ গড়ে তুলতে হলে প্রত্যেকটি নাগরিককে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। বঙ্গবন্ধু জনগণকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন বলেই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে তার ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। তারপর মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা যদি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানো না যায় তাহলে গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা কোনোভাবেই নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করলেন। বিদ্যালয় পরিচালনা অবকাঠামোগত নির্মাণসহ সকল দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করল। একই সঙ্গে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদানের ব্যবস্থা করা হলো যদিও রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল তখন শূন্য। বঙ্গবন্ধু আমাদের যে রাষ্ট্রীয় সংবিধান উপহার দিলেন, যা ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখ থেকে কার্যকর হয় তাতে শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কারণেই তাকে অবৈতনিক করা হয়। একইসঙ্গে শিক্ষাকে একমুখী করা হলো। বঙ্গবন্ধু চাইতেন প্রজাতন্ত্রের শিশুদের শিক্ষার মাঝে কোনো বৈষম্য থাকবে না। কারণ একটি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই ছিল বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। বঙ্গবন্ধু সময়ের চাহিদা পূরণ এবং একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সেই সময়ের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় একটি নতুন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কার্যকর সুপারিশ প্রণয়নের জন্য। বঙ্গবন্ধু কুদরাত-ই-খুদা এবং তাঁর কমিশনের সদস্যদের ডেকে এনে পরামর্শ দিলেন প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে কী কী বিষয় থাকতে হবে। কমিশন সেই মোতাবেক রাত-দিন খেটে ১৯৭৪ সালের ৭ই জুন একটি রিপোর্ট দাখিল করে। বঙ্গবন্ধু সেই কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করে বললেন, আমি অচিরেই এই কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করব। এ থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি, বঙ্গবন্ধু আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ওপর যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নের চেষ্টাও করে গেছেন। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের ছেদ পড়ে গেল। কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা ছিল বঙ্গবন্ধুর একটি স্বপ্ন। হত্যাকারীরা বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নকেও হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আর প্রকাশিত হয়নি।

প্রশ্ন: ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে উপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য কী ছিল?

প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক: উপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেশের তরুণ সমাজকে উপনিবেশিক দাসত্বের কাজে ব্যবহার করা। উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্ত চিন্তার বিষয়গুলো অনুপস্থিত ছিল। পাকিস্তান আমলে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সেখানে উর্দুসহ পাকিস্তানের সংস্কৃতির নানা বিষয় যুক্ত করা হয়েছিল। উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে এমন সব আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল যেখানে মুক্ত চিন্তার কোনো সুযোগ ছিল না। তিনি মুক্ত চিন্তার প্রসার এবং স্বাধীন দেশের উপযোগী করে একটি যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছিল ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট। আমরা জেনেছি, কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার সুপারিশ করা হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণরূপেই একমুখী শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। একমুখী প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর একটি শিশুর মাঝে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং মূল্যবোধ গড়ে

উঠবে যা তাকে পরবর্তীতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। মাধ্যমিক পর্যায় হবে কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং অন্যান্য নানামুখী শিক্ষা। দ্বাদশ শ্রেণির পর তারা যাবে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে। উচ্চ শিক্ষা থাকবে স্বাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থার অধীনে। যেখানে একজন ছাত্র বা ছাত্রী মুক্ত বুদ্ধি চর্চার অবারিত সুযোগ পাবে। ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ বঙ্গবন্ধু নিজেই দিয়ে গিয়েছিলেন। তখন সারা দেশে মাত্র ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কালো আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। সেই কালো আইন পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ জারি করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের জন্য যে আইন তিনি করে দিলেন সেখানে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য সবাই হবেন শিক্ষাবিদ। শিক্ষাবিদগণই মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। মন্ত্রণালয়ের যিনি শিক্ষা সচিব তিনি হবেন শিক্ষাবিদ। বঙ্গবন্ধু শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাবিদদের যথাযথ সম্মান দিয়েছেন। কারণ বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন শিক্ষাই হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। তাই তিনি গুণগত মানসম্পন্ন সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। আমরা বঙ্গবন্ধুর নিকট চির কৃতজ্ঞ যে তিনি শিক্ষা এবং শিক্ষকদের মর্যাদা দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ অনেকেই বলে থাকেন, শিক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা নীতির ভিত্তিতে এই বক্তব্যের মূল্যায়ন করবেন কী?

প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকঃ বঙ্গবন্ধু এই কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি প্রায়শই বলতেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমরা যদি এক টাকা বিনিয়োগ করি তার যে বেনিফিট আসবে তা অপরিমেয়। প্রজাতন্ত্রের একজন নাগরিককে যদি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায় তার মাধ্যমে ভবিষ্যতে দেশ যে কতভাবে উপকৃত হতে পারে তা হিসাব করে শেষ করা যাবে না। কাজেই বঙ্গবন্ধু ঠিকই অনুধাবন করেছিলেন এবং বলেছিলেন শিক্ষাই হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।

প্রশ্নঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে নানা ধরনের কথা শোনা যায়। আন্তর্জাতিকভাবে একটি দেশের জিডিপি'র অন্তত ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ এখনো অনেক কম। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা কী ছিল?

প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকঃ বঙ্গবন্ধু গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন যে রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন সেখানে এ কথা বলা ছিল, প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা ক্ষেত্রে যত অর্থ ব্যয় করা হবে তার ৬৫ শতাংশ ব্যয়িত হবে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে। ২০ শতাংশ ব্যয় করতে হবে মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষায় এবং অবশিষ্ট ১৫ শতাংশ ব্যয়িত হবে উচ্চ শিক্ষা খাতে। কারণ উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। এই বাজেট বরাদ্দের প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবসম্মত। ইউনেস্কো তাদের প্রতিবেদনে বলেছে একটি দেশের শিক্ষা খাতে জিডিপি'র ৬ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করা দরকার। আমি মনে করি, ইউনেস্কোর এই সুপারিশের পর্যায়ে পৌঁছানো আমাদের জন্য খুবই জরুরি। কিন্তু আমাদের নানা ধরনের মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্পের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হচ্ছে। সম্ভবত সে কারণেই শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী করা যাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ জিডিপি'র অন্তত ৬ শতাংশে উন্নীত করার জন্য। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সবচেয়ে প্রধান হাতিয়ার হবে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। সেই শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দরকার হবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি করা। মানসম্পন্ন শিক্ষকরাই পারেন মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে। গবেষণার জন্য আরো ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। মানসম্পন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে প্রাথমিক পর্যায় থেকে। বঙ্গবন্ধু কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন তা যদি বাস্তবায়িত হতো তাহলে আজকে শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ থাকত না। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ সময় আমরা অন্ধের মতো হেঁটেছি। কারণ আমাদের কোনো শিক্ষা নীতিই ছিল না। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে আমাদের জন্য একটি শিক্ষা নীতি দিলেন। আমরা সেই শিক্ষানীতি অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছি।

প্রশ্নঃ বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা নীতি এবং বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতির মধ্যে মিল আছে কি?

প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকঃ বঙ্গবন্ধুর আমলে ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট যেহেতু বাস্তবায়ন করা যায়নি তাই তাকে আমরা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাব্যবস্থা বলতে পারি না। তবে সেটাকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শিক্ষা নীতি বা শিক্ষা ভাবনা বলতে পারি। আমি যেটা মনে করি তাহলো, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পড়লে আমরা যেভাবে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-ভাবনাগুলোকে দেখি শেখ হাসিনা সেগুলোই বাস্তবায়ন করে চলেছেন। মোটা দাগে বলা যেতে পারে, বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-ধারাকে ধারণ করেই বর্তমান সরকার শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন করে চলেছে। সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষা নীতিকে আরো আধুনিকায়ন এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা নীতির মূল কথাই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়ন করা। বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে।

প্রশ্নঃ বর্তমান সরকার নারী শিক্ষা উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। এটা কি বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা নীতির বাস্তবায়ন বলে মনে করেন?

প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকঃ নিশ্চয়ই এটা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা নীতির প্রতিফলন। কারণ বঙ্গবন্ধু নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। বর্তমান সরকার নারীর উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব দিচ্ছেন তার মূল পথপ্রদর্শক বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের উন্নয়নের কথা বলেছেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক, গবেষক ও বিডিবিএল-এর অবসরপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক এম এ খালেক

বর্ষপণ্য: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

সানিয়াত রহমান

বদলে গেছে দৃশ্যপট। আমদানি নির্ভর ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য এখন বাংলাদেশ আর পরনির্ভশীল নয়। চীন-ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ্ব বাজারে ঠাঁই করে নিচ্ছে বাংলাদেশে উৎপাদিত ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ।

দেশের হালকা শিল্পে গত একযুগে অভাবনীয় বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোক্তারাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখছেন। দেশীয় প্রযুক্তির ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ উদ্ভাবন, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে তারা বদলে দিয়েছে বাংলাদেশকে। একদশক আগেও অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মেশিনারিজ শতভাগ আমদানি নির্ভর ছিল, আজ নিজেরাই সেসব যন্ত্রপাতি তৈরি করে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা মার্চ ২০২০ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন–পিআইডি

দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করছে। বর্তমান সরকার শিল্প ও কৃষিবান্ধব। এক্ষেত্রে কার্যকর সরকারি নীতি আরো সহায়তায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে সফলতার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছে। জিঞ্জিরা এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কয়েকযুগ ধরেই এর দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই এলাকার ঝুপড়ি বস্তিতে অজস্র কারখানায় ক্ষুদে ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি করা হাজারো পণ্যসামগ্রীর কদর রয়েছে সর্বত্র। দেশ-বিদেশে 'মেইড ইন জিঞ্জিরা' হিসেবে ব্যাপক খ্যাতিও রয়েছে সর্বত্র। বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেষা কেরানীগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়েই জিঞ্জিরা শিল্পের বিস্তার।

শ্রমিকরা রাত-দিন কাজ করছে। অনর্গল ইঞ্জিনের ধস-ধস, গড়-গড় শব্দ কারিগরদের সদা ব্যস্ততা হাকাহাকি, শ্রমিকদের কোলাহল জিঞ্জিরার নিত্যদিনের চিত্র। গোটা এলাকায় চলছে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। জিঞ্জিরায় আছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ২ হাজার কারখানা। ৬ লক্ষ শ্রমিকদের উদয়-অস্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে সম্ভাবনার আর এক বাংলাদেশ। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এই শিল্পকারখানা বিরাট অবদান রাখছে। সেই সঙ্গে ব্যক্তি পর্যায়ে ও সরকারি সহযোগিতায় নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সম্ভাবনার এই শিল্প।

পরিত্যক্ত লোহা, জাহাজভাঙা স্ক্র্যাপ, বিভিন্ন শিল্পকারখানার রোলিং মিল, নির্মাণাধীণ স্থাপনার পরিত্যক্ত সিট, টিন এগুলো থেকেই তাক লাগানো নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করছেন কারিগররা। বর্তমানে নানা ধরনের হালকা মাঝারি ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য বিশ্ব বাজারে ঠাঁই করে নিয়েছে। সুই, ব্লেড, আলপিন, নাটবল্টু, রেল, বিমানের যন্ত্রাংশ, কসমেটিক্স, মোবাইল ফোনসেট থেকে শুরু করে সমুদ্রগামী যন্ত্রাংশ তৈরি হচ্ছে এখানে। কারিগররা তেমন লেখাপড়া জানে না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও হাতে কলমে শিক্ষা আছে তাদের। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে জাপান, কোরিয়া, চীন যেসব সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাত করে সেসব পণ্য একনজর দেখলেই উৎপাদন করতে পারে জিঞ্জিরার কারিগররা। এখানকার অভাবনীয় মেধার ক্ষুদে কারিগরদের দক্ষতা আজ বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, জিঞ্জিরার মতো প্রায় ৫০ হাজার শিল্পকারখানা এদেশে গড়ে উঠেছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রত্যক্ষভাবে ১২ লাখ শ্রমিক এবং পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে ৬০ লাখ মানুষের জীবন ও জীবিকা।

বর্তমানে দেশে হালকা প্রকৌশল শিল্পে ৪ হাজারের ওপরে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরি হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং মালিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, ১৩৭টি ইঞ্জিনিয়ারিং আইটেম দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের ১৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমানে বার্ষিক ৪৫ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হচ্ছে। সরকারের প্রায় ৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব আসে এ খাত থেকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হালকা প্রকৌশল পণ্যকে ২০২০ সালের 'বর্ষপণ্য' ঘোষণা করায় সরকারিভাবে এ শিল্প খাতটি বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি,আমরা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের অধীনে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে আরো বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবো। গত দুই দশকে জিঞ্জিরা শিল্প অগ্রসর হয়েছে অনেক দূর। এখন আর তা জিঞ্জিরা- কেরানীগঞ্জেই সীমাবদ্ধ নেই, সম্প্রসারিত হয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে এমনকি দেশজুড়ে। রাজধানীর মীরহাজারিবাগ, মাতুয়াইল, ডেমরা, চকবাজার, লালবাগ, ইসলামবাগসহ মীরপুরের বিভিন্ন স্থানে জিঞ্জিরা শিল্পের আদলে গড়ে উঠেছে অনেক কলকারখানা। কোনো কোনো উদ্যোক্তারা বাসাবাড়ির দু-একটা কক্ষে বাস করছে এবং এর সঙ্গে বাড়ির অন্য অংশে কারখানা গড়ে তুলছে। এসব কারখানায় কয়েকজন কারিগর নিয়ে উৎপাদন করছে নানা ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য। ক্ষুদে কোনো উদ্যোক্তা যার সামান্য পুঁজি, তিনিও একটি বোতাম কারখানা কিংবা ফ্যানের কয়েল বাঁধানো কাজে নিয়োজিত থাকছেন। শুধু মডেল হিসেবে জিঞ্জিরা মডেল অনুসরণ করে রাজধানীর বাইরে নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, চট্টগ্রাম, যশোর, নওগাঁপাড়া, টঙ্গি, গাজীপুর, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের খুদে ও মাঝারি শিল্প ইউনিট। কোনো কোনো কারখানায় শুধু পণ্যই উৎপাদন হচ্ছে না, মেশিনারিজও বানানো হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র বগুড়ায় কৃষি যন্ত্রাংশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঘটে গেছে নীরব বিপ্লব।

বিসিক শিল্পনগরীসহ বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে কয়েকশত কলকারখানা। কলকারখানায় তৈরি যন্ত্রাংশের মধ্যে রয়েছে পানির পাম্প, টিউবওয়েল, শ্যালো ইঞ্জিনের লারনার, পিস্টন, পাওয়ার টিলার, ধান ও ভুট্টো মাড়াই মেশিনসহ কৃষি উপকরণাদি। এছাড়াও কৃষি উৎপাদনের সহযোগী মেশিনারিজ, প্লানার, ক্রাংক শ্যাফট গ্রানডিং মিলিং শেপার বোরিং মেশিন, লেদ মেশিন তৈরি হচ্ছে। পরিত্যক্ত ভাঙা যন্ত্রপাতি পুনরায় ব্যবহার করেই তৈরি হচ্ছে কৃষি যন্ত্রাংশ।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির স্বজনই বঙ্গবন্ধু

রহিম আব্দুর রহিম

পাখপাখালির কুহুতান, আঁকাবাঁকা মেঠোপথ, হালধরা মাঝির ভাটিয়ালি সুর, প্রত্যন্ত গ্রামের বুক ছিঁড়ে প্রবাহিত মধুমতির শাখা বাইগার নদী। এই নদীর তীরঘেঁষে সাজানো গোছানো গ্রাম টুঙ্গিপাড়া। আজ থেকে শত বছর আগের কথা। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ (১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২০শে চৈত্র) মঙ্গলবার শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়রা খাতুনের ঘরে জন্ম নিলেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। বাবা-মায়ের আদরের 'খোকা' শৈশব থেকেই দুরন্ত, ডানপিটে, নদীতে লাফঝাঁপ, বন্ধুদের সাথে মেলামেশা, ধুলো-কাদায় মাখামাখি, বাবুই পাখির বাসা খোঁজা, মাছরাঙার মাছ শিকার অবলোকন, দোয়েল পাখির সুর শোনাই ছিল খোকার শৈশবের বড়ো নেশা। গ্রামের সব শিশুদের সঙ্গে দলবেঁধে ঘুরে ফিরে প্রকৃতিকে আপন করে নেন। শালিক ও ময়না পাখির ছানা ধরে এনে তাদের সাথে কথা বলা, শিস দেওয়া, বানর ও কুকুর পোষাই ছিল দুরন্ত ডানপিটে টুঙ্গিপাড়ার এই প্রকৃতিপ্রেমী খোকার ছোটোবেলা। খোকাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে একটি সরু খাল চলে গেছে মধুমতি ও বাইগার নদীর সংযোগ লক্ষ্য করে। এই খালের পাড়ে বাবা লুৎফর রহমানের 'কাঁছারি ঘর' আর এই কাঁছারি ঘরের পাশেই ছিল খোকার মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলবি সাহেবদের থাকার ঘর। এরাই গৃহশিক্ষক হিসেবে খোকাকে আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শেখাতেন।

শেখ মুজিবের শৈশবকালের কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করে তিনি ছিলেন মাটি-মানুষের প্রিয়জন, পশুপাখি, গৃহপালিত প্রাণীদের পরম বন্ধু। তাঁর পশু প্রেমই প্রমাণ করে সেই অমর বাণী, 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' শেখ মুজিব ছোটো থেকেই ছিলেন যেমন দুরন্ত, চঞ্চল তেমনি দুষ্টুমিতে পরিপূর্ণ। তবে তিনি কোনোদিনই তাঁর শিক্ষকদের সাথে বেয়াদবি করেননি। শিক্ষকদের তিনি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতেন, কখনো মাথা উঁচু করে কথা বলেননি। নিচু হয়ে বিনম্র ভাষায় স্যারদের সাথে কথা বলতেন। একদিনের এক ঘটনা, খোকা পড়া শেখেনি বলে তাঁর শিক্ষক তাঁকে কষে এক থাপ্পড় দিয়েছিলেন। এতে খোকা মাটিতে পড়ে যায়। এই শিক্ষক তাঁদের বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় যেদিন চলে যান, সেই দিন খোকা নামের আদর্শ এই শিশুটি ওই শিক্ষকের বিছানাপত্র ও প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় নিজে মাথায় বহন করে তিন কিলোমিটার দূরে ওই শিক্ষকের নতুন কর্মস্থলে দিয়ে আসেন। আসার পথে শিক্ষকের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদও নেন। খোকা ছোটো থেকেই নামাজ পড়েছেন, রেখেছেন রোজা, আবার গ্রামের হিন্দু পরিবারের সাথে অবাধে মেলামেশা করেছেন, তাদের পূজা-পার্বণে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে প্রসাদ নাড়ু খেতে ভুলেননি। ফলে তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তিনি কখনই বাবা-মা'র অবাধ্য হননি। বাবা-মা যা বলতেন, তাই তিনি শুনেছেন, করেছেন। ছোটোবেলায় তিনি ব্রতচারিনৃত্য শেখেন যে নৃত্য মানুষকে দেশপ্রেমী করে গড়ে তোলে। সন্ধ্যা নামলেই তিনি পাড়ার সব ছেলেদের সাথে নিয়ে গ্রামের জারি, সারি, পালাগান, যাত্রাগান শুনতে যেতেন। লুকিয়ে আবার ঘরেও আসতেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি ফুটবল খেলায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রাম থেকে মধুমতি নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লারহাটে যেতেন ফুটবল খেলতে। এতে করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাবা-মা খুবই খুশি হতেন, তাঁকে অনুপ্রেরণাও দিতেন। বাবা-মা'র অনুপ্রেরণায় শেখ মুজিবুর রহমান শৈশব থেকেই ভালো ফুটবল খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন। মাঠে-ময়দানে খেলাধুলা করায় মানুষের সাথে তাঁর পরম বন্ধুত্ব এবং দেশপ্রেমিক হওয়ার আদর্শিক শিক্ষা ও প্রকৃতিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হন তিনি। খেলাধুলা যে শুধু শারীরিক যোগ্যতার পাথেয় তা নয়, মাটি-মানুষের প্রতি পরম প্রেমবোধ জাগিয়ে তোলে, তার অকাট্য প্রমাণ শেখ মুজিব। যে কারণে তিনি বাঙালির আদি সংস্কৃতি রক্ষায় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিল্পকলা একাডেমির কর্মকাণ্ডে বাঙালির আদি সংস্কৃতি লালনপালন এবং সংরক্ষণের নীতিমালা সংযুক্ত করেন। তিনিই বায়তুল মোকাররম মসজিদ জাতীয়করণ এবং তার সম্প্রসারণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন। তাবলিগ জামায়াতের জন্য তিনি কাকরাইল মসজিদ এবং বিশ্ব ইস্তেমার জন্য টঙ্গিতে জায়গা নির্ধারণ করেন।

গ্রামের শিশু-কিশোরদের সাথে দলবেঁধে পথচলায় বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন শৈশব থেকেই জনপ্রিয় মানুষ। তিনি অন্যের কষ্টে ব্যথিত হতেন। একবার দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল। কৃষি মাঠে ভালো ফসল হয়নি। শেখ মুজিব তখন গোপালগঞ্জে থাকেন। গ্রামের বাড়িতে গেলেন বেড়াতে। এলাকার মানুষ অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। চতুর্দিকে দুর্ভিক্ষ। মুজিব আর স্থির থাকতে পারলেন না। সেদিন বাড়িতে কেউ নেই। বাবা লুৎফর রহমান গেছেন পাটগাঁও পোস্ট অফিসে। ফিরতে অনেক দেরি হবে। এই সুযোগে তিনি গ্রামের লোকজনদের ডেকে নিজেদের গোলার ধান বিলিয়ে দেন। বাবা বাড়ি এসে সবকিছু জানলেন, শেখ মুজিবের ওপর মনে মনে ক্ষেপে গেলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। এতে করে প্রমাণ হয়, আদর্শ বাবা-মা'রাই পারেন একজন দেশ দরদি মানবপ্রেমী মানুষ সৃষ্টি করতে। পরিবেশ, প্রতিবেশের বাস্তবতায় ব্রিটিশ পাকিস্তানের অত্যাচার, অনাচার, নিপীড়ন, নির্যাতনের হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্তি দিতে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ রেসকোর্সের ময়দানে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। শৈশবের খোকা হয়ে ওঠেন 'জাতির পিতা'। অমর ইতিহাসে গ্রন্থিত হয়– 'বঙ্গবন্ধু' হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

১৯৭১ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম জন্মদিনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, এদেশে জন্মদিনই বা কী আর মৃত্যু দিনই বা কী, আমার জনগণই আমার জীবন। তাঁর এই বক্তব্যই প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু বিশাল হৃদয়, মহৎ গুণ ও মনের অধিকারী ছিলেন, দেশের মানুষকে তিনি প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। বঙ্গবন্ধুর ৫৪তম জন্মদিনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড মনি সিংহ বলেছিলেন, '১৯৫১ সালে কারাগারে বসেই শেখ মুজিব বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরিকল্পনা করেছিলেন।' স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে কুলাঙ্গাররা চেয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কিন্তু তা হয়নি বরং পৃথিবীর ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের প্রতিটি সদস্য বিশাল জায়গায় স্থান পেয়েছেন।

লেখক: শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, নাট্যকার ও শিশু সংগঠক

নিবন্ধ

প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকার

মাহমুদ হাসান

অটিজম হচ্ছে শিশুদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশের একপ্রকার প্রতিবন্ধকতা, যা সাধারণত শিশুর তিন বছরের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে। অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ, সামাজিক আচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহে বেশ সমস্যা লক্ষ করা যায়। সাম্প্রতিককালে বিশেষজ্ঞরা অটিজমকে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার বলে আখ্যায়িত করেছেন। অটিজমের কারণ এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব না হলেও অনেকে মনে করেন মস্তিষ্কে কিছু কোষের অস্বাভাবিক রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ কিংবা মস্তিষ্ক কোষের অস্বাভাবিক গঠন এর জন্য দায়ী। আবার অনেকে মনে করেন যে, বংশগত কারণে এরূপ অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রদানে বদ্ধপরিকর। এলক্ষ্যে ২০০১ সালে 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১' প্রণয়ন করা হয়।

এ আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে অন্যান্য দলিল হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৭ এবং ১৯

অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে প্রতিবন্ধীদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে এ দায়দায়িত্বের অংশ হিসেবে ২০০৫-২০০৬ অর্থবছর থেকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার গঠনের পর ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সহায়তার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে ৬৪টি জেলা সদর ও উপজেলায় ১০৩টি স্থানে বিনামূল্যে সেবাদানের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করেছেন। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে রূপান্তরকরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

বর্তমানে দেশের ১০৩টি স্থানের প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে দায়িত্ব পালনরত প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপি), ক্লিনিক্যাল ফিজিও থেরাপিস্ট, থেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ অ্যান্ড লেঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট, থেরাপি, সহকারী, টেকনিশিয়ান-১ (অডিও মেট্রিশিয়ান); টেকনিশিয়ান-২ (অপটোমেট্রিশিয়ান), অফিস সহকারী, স্টাফ ও গার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। প্রতিটি কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিনামূল্যে প্রতিবন্ধিতার ধরন নির্ণয় এবং সমস্যা সমাধানে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, অটিজম কর্ণার সেবা, পক্ষাঘাতগ্রস্তদের সেবা, কাউন্সেলিং-প্যারালাইসিস, ফ্রোজেন সোল্ডার, বাত-ব্যথা, আর্থ্রাইটিস, স্পোর্টস ও আঘাতজনিত সমস্যা সহায়ক উপকরণ বিতরণসহ জনসচেতনা সৃষ্টির পরিচালনা করছেন। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রগুলোতে আরো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে বর্তমান সরকারের আমলে চালুকৃত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে কয়েক লাখ প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি থাকা ব্যক্তিরা সেবাপ্রাপ্ত হয়েছেন, যাদের অনেকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন।

২০১৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সরকারি তত্ত্বাবধানে বিনামূল্যে চৌদ্দ সহস্রাধিক প্রতিবন্ধী সেবাসহ ১৮৩টি হুইল চেয়ার, ৫টি ট্রাইসাইকেল, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সাদাছড়ি, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য হিয়ারিং এইড ও ক্রাচ বিতরণ করা হয়। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে অটিজম রিসোর্স সেন্টারের নিয়মিত সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এমনকি অটিজম শিশুদের খেলাধুলার জন্য অটিজম রিসোর্স সেন্টারের আঙ্গিনায় সরকারি বরাদ্দে নির্মিত হয়েছে একটি বিনোদন পার্ক।

সরকার মূলত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে অটিজম সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি, ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস, প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কার্যক্রম, কর্মজীবী প্রতিবন্ধী হোস্টেল, ঋণ ও অনুদান কর্মসূচি, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, চিড়িয়াখানা পরিদর্শনের জন্য প্রবেশ ফি সম্পূর্ণ মওকুফ করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস এবং অন্যান্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯-এর আওতায় বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিল্পীদের অর্কেস্ট্রা দলগঠন, প্রতিবন্ধিকতা উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন, প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ, প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪ লাখ থেকে ৬ লাখ, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির সংখ্যা ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৬০ হাজারে উন্নীতকরণসহ মাসিক ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এছাড়া প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার উন্নয়নে ক্ষেত্রে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্কাউট জাম্বুরিতে অংশগ্রহণ, টুয়েন্টি ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন, বিভাগীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ইত্যাদি কাজে তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়গণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদকসহ ফুটবল, ক্রিকেট খেলায় চ্যাম্পিয়ন, রানার আপ-এর মতো কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এমনকি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শিল্পীরা ছবি অঙ্কন করেও পুরস্কৃত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির সঙ্গে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিসিবি যৌথভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধী ক্রিকেটারদের নিয়ে আয়োজন করেছিল জাতীয় আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট, যেখানে বাংলাদেশি টাইগাররা সাফল্যের পরিচয় দেখিয়েছে। ২০১৯ সালের জুলাই মাস থেকে প্রায় ১৪ লাখ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চতকল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ প্রণয়ন করেছে। যার যথাযথ বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ ২০১৯ সালের জুলাই থেকে প্রায় ১৪ লাখ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সমাজের মূল স্রোতে এক কাতারে শামিল করছে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

৭ই মার্চ ১৯৭১, রমনা রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনতার উদ্দেশে ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান –ফাইল ছবি

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা
স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা

কে সি বি তপু

বাঙালির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি স্বাধীনতা অর্জন। আর এ অর্জনের সুনিপুণ কারিগর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার আগে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে সংগ্রামের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ ভাষণে উচ্চকিত 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে', 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ', 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– ইত্যাদি মর্মস্পর্শী ওজস্বী আহ্বান নিরস্ত্র বাঙালিকে বীর মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত করেছে। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণে বাঙালির শিরায় শিরায় আবেগ আর উত্তেজনার ঢেউ খেলে এবং মুক্তি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন ভূ-খণ্ড হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর আপোশহীন সংগ্রামী নেতৃত্বের দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, মেধা, দৃঢ়তা ও নির্ভীক চেতনায় গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৬৬'র ছয় দফা সংবলিত স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে সময়োপযোগী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আসে বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে তাঁর দীর্ঘ অবিচল সংগ্রাম যেমনি বাংলাকে দিয়েছে স্বাধীনতা, তেমনি তাঁকেও উপনীত করেছে মুজিব ভাই থেকে বঙ্গবন্ধুতে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা থেকে জাতির পিতায়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে দাবি আদায়ে অবিচল থাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু এতে তিনি দমে যাননি বরং জেল-জুলুম এমনকি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাঙালির অধিকার আদায়ে একত্র করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন নানাভাবে নানারকম রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে। মূলত মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের এই দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিক নির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভেবেচিন্তেই সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতার পথে তাঁর সেই সময়োপযোগী চিন্তার ফসলই ছিল ঐতিহাসিক ছয় দফা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা দিয়ে একটি অভূতপূর্ব গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা।

আওয়ামী লীগের ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির আপাত লক্ষ্য এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন অর্জন কিন্তু সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল মুক্তি অর্জন। শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন মূলত ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর। কেননা এ যুদ্ধে পরিষ্কার হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান প্রতিরক্ষাহীন। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে অনেকের মনে গভীর নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হলো। এমনি প্রেক্ষাপটে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'ছয় দফা' পেশ করেন। তাজউদ্দীন আহমদ ও ছাত্রলীগের নেতাদের দৃঢ় সমর্থনের ফলে আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচিকে দলীয় কর্মসূচি রূপে গ্রহণ করে। ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান অসাধারণ জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৪৮-১৯৬৫

সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বাঙালির সীমাহীন বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায্য অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষার সুচিন্তিত দলিল ছিল ছয় দফার দাবি। ছয় দফা সংবলিত স্বায়ত্তশাসন দাবির মূল বক্তব্য ছিল প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ছাড়া আর সব ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতারা এই ছয় দফাকে বাঙালির বাঁচার দাবি হিসেবে অভিহিত করে সারা বাংলায় প্রচার করেন। এই ছয় দফা দেশে অসামান্য গণজাগরণ সৃষ্টি করে, গ্রামগঞ্জে এর বার্তা পৌঁছে যায়। ছয় দফা কার্যত জনগণের দলিলে পরিণত হয়েছিল।

ছয় দফার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে কর্মসূচি স্তব্ধ করে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করা হলো দেশ রক্ষা আইনে। আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাকেও আটক করা হলো। শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য বন্দি নেতার মুক্তির দাবিতে ৭ই জুন পূর্ব পাকিস্তানে পালিত হলো সর্বাত্মক ধর্মঘট। শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যদের বিরুদ্ধে আনা হলো দেশদ্রোহের অভিযোগ। দায়ের করা হলো 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মামলা' যা সাধারণভাবে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মামলার বিচার শুরু হলে দানা বাঁধতে শুরু করে আইয়ুববিরোধী দুর্বার গণ-আন্দোলন। এ আন্দোলনের নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিল সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দাবি-দাওয়ার সঙ্গে কৌশল করে ছয় দফার মিশেলে এগারো দফা রচিত হয়। শুরু হলো ছাত্রসমাজের আইয়ুববিরোধী আন্দোলন। নভেম্বর মাসে সে আন্দোলন বেশ বেগবান হয়ে উঠল। আর ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সে আন্দোলন পরিণত হলো অপ্রতিরোধ্য গণ-অভ্যুত্থানে; অবশেষে ২২শে ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল বন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হলো সরকার। ২৩শে ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত গণসংবর্ধনায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় ভূষিত করলেন পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ। শেখ মুজিবুর রহমান পরিণত হলেন মুজিব ভাই থেকে বঙ্গবন্ধুতে।

ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তিসনদ, স্বাধীনতার বীজ। ছয় দফার পথ বেয়েই এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ছয় দফা কর্মসূচি পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। ছয় দফা উত্থাপন এবং এটিকে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে সঠিক ক্ষণ নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণেই। বাঙালি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি সংবলিত ঐতিহাসিক ছয় দফা বাংলাদেশের 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবে খ্যাত। এ আন্দোলনের ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলা) জনগণের মধ্যে 'জাতীয় চেতনা' সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ছয় দফা আন্দোলনের পথ ধরে আসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, এর বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচন। ১৯৭০-এর নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের প্রতি পূর্ণসমর্থন ব্যক্ত করে এ দেশের জনগণ। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির গণ-অভ্যুত্থান এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছয় দফা অন্যতম মাইলফলক।

বঙ্গবন্ধুর অপরিমেয় কৃতিত্ব এই যে, ছয় দফার সর্বাত্মক রায় ঘোষিত হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করলেও বিজয়ী দলকে সরকার গঠন করতে না দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র শুরু করলে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ বঙ্গবন্ধু অসীম সাহসের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

উল্লেখ্য যে, বাংলার স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবন ছিল সংগ্রামে পরিপূর্ণ। অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি বহুবার জেল খেটেছেন। পাকিস্তান আমলে তাঁর জীবনের এক যুগেরও বেশি সময় জেলের মধ্যেই কেটেছে। বঙ্গবন্ধুকে আটক করেছে কিন্তু অভিযোগের প্রমাণের অভাবে সাজা দিতে না পেরে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে শাসকগোষ্ঠী। বঙ্গবন্ধু স্বাধিকার-স্বায়ত্তশাসন-স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হলেও কৌশলের কারণে তাঁকে অভিযুক্ত করার উপায় ছিল না। তিনি সংগ্রামী নেতা হিসেবে অনন্য উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি ছয় দফাকে এক দফায় পরিণত করেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির মহান বীরপুরুষ। তিনি বীর বাঙালির প্রতীকে পরিণত হন। সম্মোহনী শক্তির অধিকারী বাংলার জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ছিল ঐন্দ্রজালিক মহাশক্তি। তিনি রাজনীতির মহান কবি, যাঁর ভাষণ শুধু আকর্ষক নয়, কাব্যিক-ব্যঞ্জনাময়ও। তাঁর ভাষণ এবং এসব আন্দোলনে ধ্বনিত– আমি কি তুমি কি, বাঙালি বাঙালি; তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা; বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু; এমন ধরনের অসংখ্য স্লোগান এবং জাতীয় পতাকা তৈরি ও উত্তোলন প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহ বাঙালিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বীর বাঙালিতে উপনীত করে।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার অনুরণন সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখা, সর্বোপরি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট শীর্ষক বর্বর আক্রমণে বীভৎস গণহত্যায় বাঙালি নিধনযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়াতেও ছিল তাঁর দূরদর্শিতা। তদুপরি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর অনুপস্থিতিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলাদেশের সরকার গঠন এবং এ সরকার দ্বারা পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধ পেয়েছে বৈশ্বিক ও আইনগত বৈধতা। এতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় সহজতর হয়েছিল। তাই বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ পেয়েছে স্বীকৃতি।

স্বায়ত্তশাসন দাবির ১৯৬৬-এর ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, আপামর বাঙালির দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমানের বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হওয়া, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, বিজয়ী দলকে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্র, অসহযোগ আন্দোলন, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা ঘোষণা, বিজয় অর্জন ইত্যাদি রাজনৈতিক ঘটনাবলি ধারাবাহিকভাবে সংঘটনে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বের অনুপস্থিতি ঘটলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের গতিপথ হতো অন্যরকম; যা আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত, অকল্পনীয়ও বটে।

বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রামী নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বের অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহসী বিচক্ষণ নেতৃত্বগুণ ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যেই এনেছে বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবি থেকে স্বাধীনতা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখিয়েছেন তাঁর অসাধারণ দূরদর্শিতা। তিনি বাংলার সফল স্বপ্নদ্রষ্টা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও বাঙালি জাতির পিতা। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরভাস্বর।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করুন

মাহবুবা আলম

ডায়াবেটিস শব্দটি আমাদের সবার কাছেই বেশ পরিচিত। এমন কোনো পরিবার খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে কোনো ডায়াবেটিসের রোগী নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, ডায়াবেটিস এখন একটি মহামারি রোগ। এই রোগের অত্যধিক বিস্তারের কারণেই সম্প্রতি এমন ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

প্রশ্ন আসতেই পারে, ডায়াবেটিস কি? আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন বলছে, ডায়াবেটিস এমনই একটি রোগ, যা কখনো সারে না। কিন্তু এই রোগকে সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আইরিশ ইনডিপেনডেন্টের খবরে বলা হয়েছে, যখন আমরা কার্বোহাইড্রেট বা সাধারণ শর্করা জাতীয় খাবার খাই, তখন তা ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয়। আর ইনসুলিন হচ্ছে এক ধরনের হরমোন। এর কাজ হলো এই গ্লুকোজকে মানুষের দেহের কোষগুলোয় পৌঁছে দেওয়া। এরপর সেই গ্লুকোজ ব্যবহার করে শরীরের কোষগুলো শক্তি উৎপাদন করে। সেই শক্তি দিয়েই প্রতিদিনের কাজকর্ম করে থাকে মানুষ। সুতরাং যখন এই গ্লুকোজ শরীরের কোষে পৌঁছাবে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের দৈনন্দিন কাজ ব্যাহত হবে। যখন কারো ডায়াবেটিস হয়, তখন ওই মানুষের শরীরে ইনসুলিন হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে দেহের কোষে গ্লুকোজ পৌঁছাতে পারে না। এতে করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। সাধারণত প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত গ্লুকোজ শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এই কারণে ডায়াবেটিস রোগীর ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। যখন প্রস্রাব বেশি হয়, তখন ডায়াবেটিসে ভোগা রোগী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়ায় রোগীর শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ বের হয়ে যায়। এতে করে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করতে পারে না দেহের কোষগুলো। ফলে রোগী দুর্বলতা অনুভব করেন। রোগী যদি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তবে তার রক্তনালি, স্নায়ু, কিডনি, চোখ ও হৃদযন্ত্রের সমস্যাসহ নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

সুনির্দিষ্ট লক্ষণ

১. ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, ২. খুব বেশি পিপাসা লাগা, ৩. বেশি ক্ষুধা পাওয়া, ৪. যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া, ৫. ক্লান্তি ও দুর্বলতা রোধ করা।

সুনির্দিষ্ট লক্ষণ নয়

১. ক্ষত শুকাতে বিলম্ব হওয়া, ২. চোখে কম দেখা, ৩. খোশ-পাঁচড়া, ফোঁড়া প্রভৃতি চর্মরোগ দেখা দেওয়া, ৪. বারে বারে প্রসব সমস্যা বা বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

কাদের ডায়াবেটিস হতে পারে

যে কেউ যে-কোনো বয়সে যে-কোনো সময় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে নিম্নে উল্লেখিত শ্রেণির লোকের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ক. যাদের বংশে, যেমন– বাবা-মা বা রক্ত সম্পর্কিত নিকট আত্মীয়ের ডায়াবেটিস আছে, খ. যাদের ওজন অনেক বেশি বা পেট ভুরি বেশি, গ. যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করেন না, ঘ. বহুদিন স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে, ৫. বহুমূত্র পূর্ব শর্করা আধিক্য।

ডায়াবেটিসকে মূলত চার শ্রেণিতে বা ধরনে বিন্যাস করা হয়েছে।

১. ধরন-১ (Type-1)

২. ধরন-২ (Type-2)

৩. বিবিধ কারণভিত্তিক শ্রেণি

৪. গর্ভকালীন ডায়াবেটিস

১. ধরন-১ (Type-1): পূর্বে এই শ্রেণিকে ইনসুলিন নির্ভরশীল রোগ বলা হতো। এই ধরনের রোগীদের শরীরে ইনসুলিন একেবারেই তৈরি হয় না। সাধারণত ৩০ বছরের কম বয়সে (গড় বয়স ১০-১২ বছর) এ ধরনের ডায়াবেটিস দেখা যায়। বেঁচে থাকার জন্য এসকল রোগীকে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতেই হয়। অন্যথায় রক্তের শর্করা অতি দ্রুত বেড়ে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই রক্তে অম্লজাতীয় বিষক্রিয়ায় অজ্ঞান হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অবস্থায় প্রস্রাবে এসিটোন পাওয়া যায়। এই ধরনের রোগীরা সাধারণত কৃশকায় হয়ে থাকেন। সৌভাগ্যবশত আমাদের দেশে ইনসুলিন নির্ভরশীল ধরন-১ রোগীর সংখ্যা খুবই কম। এদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক ইতিহাস থাকে না।

২. ধরন-২ (Type-2): এই শ্রেণির রোগীর বয়স অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৩০ বছরের উপরে হয়ে থাকে। তবে আজকাল ৩০ বছরের নিচেও এই ধরনের রোগীর সংখ্যা দেখা দিচ্ছে এবং দিনে দিনে বেড়ে চলছে। এদের শরীরে ইনসুলিন তৈরি হয় তবে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় অথবা শরীরের ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা কম। অনেক সময় এই দুই ধরনের কারণ একইসঙ্গে দেখা দিতে পারে। ইনসুলিন কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ার সাথে সাথে এই ধরনের রোগীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থূলকায় হয়ে থাকে। এই ধরনের রোগীদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক ইতিহাস পাওয়া যায়। ইনসুলিন ইনজেকশন না দিলে প্রথম শ্রেণির রোগীর মতো এদের কিটোসিস হবে না। অর্থাৎ এরা ইনসুলিন নির্ভরশীল নয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো শারীরিক অসুবিধা অনুভব করেন না বলে এরা চিকিৎসকের কাছে আসেন না। ফলে বিনা চিকিৎসায় অনেক দিন কাটানোর কারণে বিভিন্ন প্রকার জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে আসেন। অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন এবং

নিয়মিত ব্যায়ামের সাহায্যে এদের চিকিৎসা করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ না হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ খেতে হয়। কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সাময়িক ইনসুলিন প্রয়োজন হতে পারে। ১৫-২০ বছরের পর অনেককে ইনসুলিন নির্ভরশীলদের মতো স্থায়ীভাবে ইনসুলিন দেওয়া লাগতে পারে।

৩. বিবিধ কারণ ভিত্তিক শ্রেণি

১. জেনেটিক কারণে ইনসুলিন তৈরি কম হওয়া, ২. জেনেটিক কারণে ইনসুলিন কার্যকারিতা কমে যাওয়া, ৩. অগ্ন্যাশয়ের বিভিন্ন রোগ, ৪. অন্যান্য হরমোন আধিক্য, ৫. ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারণে, ৬. কোনো কোনো সংক্রমণ ব্যাধি, ৭. অন্যান্য কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতার জটিলতা।

৪. গর্ভকালীন ডায়াবেটিস: অনেক সময় গর্ভবতী অবস্থায় প্রসূতিদের ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। আবার প্রসবের পর ডায়াবেটিস থাকে না। এই প্রকার জটিলতাকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বলা হয়। গর্ভবতী মহিলাদের ডায়াবেটিস হলে গর্ভবতী, ভ্রূণ প্রসূতি ও সদ্য-প্রসূত শিশু সকলের জন্যই বিপজ্জনক হতে পারে। বিপদ এড়াবার জন্য গর্ভকালীন অবস্থায় ডায়াবেটিসের প্রয়োজনে ইনসুলিনের মাধ্যমে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা আবশ্যক। এদের প্রসব হাসপাতালে করানো বাঞ্ছণীয়। গর্ভকালীন সকল মহিলাকে বিশেষ করে যাদের ঝুঁকি আছে যেমন– বংশ প্রভাব, স্থূলকায়, বেশি বয়স্ক ইত্যাদি। এ ধরনের মহিলাদের ডায়াবেটিস আছে কি-না পরীক্ষা করাতে হবে। এই ধরনের রোগীদের পরবর্তী সময়ে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশ্ব ডায়াবেটিস ফেডারেশনের (আইডিএফ) ২০১৫ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী ডায়াবেটিসের কারণে বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে একজন মৃত্যুবরণ করছে। প্রতি ১২ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। বিশ্বে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা সাড়ে ৪১ কোটির মতো। ২০১৫ সালে প্রকাশিত উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ৭১ লাখ লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। আরো ৭১ লাখ লোক শনাক্তের বাইরে। সে হিসাবে ধারণা করা হচ্ছে, সেই সময়ে বাংলাদেশে ১ কোটি ৪২ লাখ লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। দেশে বাড়ছে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও। বাংলাদেশে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় তুলনামূলক বেশি। প্রতিবছরে বাড়ছে আরো ১ লাখ রোগী। সব বয়সের লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছে। দিন দিন বাড়ছে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা। বর্তমানে সারা বিশ্বে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান দশমে।

বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে ডায়াবেটিস মহামারি হয়ে উঠেছে। একটি আতঙ্কের নাম হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে ৬৪ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

ডায়াবেটিসের মতো একটি ক্রনিক রোগ, ব্যক্তি, পরিবার, দেশ এমনকি সারাবিশ্বের জন্য গুরুতর ঝুঁকি বহন করে– এমন সত্য অনুধাবন করে জাতিসংঘ ২০০৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১/২২৫ নম্বর ঘোষণায় ডায়াবেটিস দীর্ঘমেয়াদি, অবক্ষয়ী ও ব্যয়বহুল ব্যাধি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ডায়াবেটিস মানবদেহে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করে।

কোনো কোনো চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডায়াবেটিসকে সকল রোগের জননী বলে অভিহিত করেন। কাঠের সাথে ঘুনের যে সম্পর্ক, শরীরের সাথে ডায়াবেটিসেরও সে সম্পর্ক। ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে শরীর ঘুণেধরা কাঠের মতো ভেঙে পড়ে। শরীরের হার্ট, কিডনি, চোখ, দাঁত, নার্ভ সিস্টেম-এ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস হতে পারে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে। ডায়াবেটিস আক্রান্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি ওজনের শিশু জন্ম, মৃত শিশুর জন্ম, অকালে সন্তান প্রসব, জন্মের পরেই শিশুর মৃত্যু এবং নানা ধরনের জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে। এমনকি আক্রান্ত হন নানা জটিল ব্যাধিতে।

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এলক্ষ্যে বর্তমান সরকার ১৭ই মার্চ ২০২০ মুজিববর্ষের প্রথম দিনে রাজধানীর শিশু হাসপাতালে বছরব্যাপী মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে শিশুদের জন্য টাইপ-১ ডায়াবেটিস সেবা কর্নার উদ্‌বোধন করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। শিশুদের ডায়াবেটিস সেবা কার্যক্রমের আওতায় দেশের ৮ বিভাগে ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শহীদ তাজউদ্দীন কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর ও ঝিনাইদহ ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ও মানিকগঞ্জে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালসহ মোট ১২টি হাসপাতালে ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ডায়াবেটিস সেবা কর্নারের কাজ শুরু হয়েছে– যা দেশের কোমলমতি শিশুরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া এই কর্নারগুলো থেকে নিয়মিত সেবা লাভ করে উপকৃত হবে। আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশ সরকারের এসব কর্মসূচি সর্বোপরি গণসচেতনতা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাফল্য নিয়ে আসবে, যা ত্বরান্বিত করবে বর্তমান সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

বিশ্ব কিডনি দিবস

১২ই মার্চ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব কিডনি দিবস পালিত হয়। প্রতিবছর মার্চের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার দিবসটি পালিত হয়। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে– সুস্থ কিডনি, সর্বত্র সবার জন্য। দিবসটি উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ কিডনি ফাউন্ডেশন, ক্যাম্পাস, বাংলাদেশ রেনাল এসোসিয়েশন, পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে।

বিশ্বের সব জনগোষ্ঠীর প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজন কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। কিডনি রোগের এই প্রকট অবস্থার জন্যে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে বিশ্ব কিডনি দিবস উদ্‌যাপিত হয়। শুধু জনগণের মধ্যে সচেতনতা নয়, সেই সাথে ডাক্তার, সেবিকাও জনস্বাস্থ্য সেবার সাথে জড়িত স্বাস্থ্যকর্মী ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং একই সাথে প্রতিরোধ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা কিডনি দিবস পালনের উদ্দেশ্য।

দেশে প্রায় ৪০ হাজার রোগী দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগে আক্রান্ত। শুধু বাংলাদেশে নয়, বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৮৫ কোটি মানুষ কিডনি রোগে আক্রান্ত। প্রতিবছর ২ দশমিক ৪ মিলিয়ন মানুষ দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগে আক্রান্ত ১ দশমিক ৭ মিলিয়ন মানুষ আকস্মিক কিডনি রোগে মারা যায়।

এ রোগে আক্রান্তদের এক সময় কিডনি বিকল হয়ে যায়। তখন ডায়ালাইসিস বা কিডনি সংযোজন ছাড়া বাঁচার উপায় থাকে না। অথচ কিডনি রোগ প্রতিরোধযোগ্য যদি সঠিক সময়ে শনাক্ত করা ও চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং কিডনি রোগকে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা ও শনাক্তকরণ এবং এ ব্যাপারে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

প্রতিবেদন: জামিলুর রহমান

আমাদের লোকজ শিল্প ও ঐতিহ্য

সাইমন ইসলাম সাগর

বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্যের উৎপত্তি স্থল হলো গ্রাম। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, লোক ও কারুশিল্প উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছে। আয়তন ও বৈচিত্র্যের তুলনায় বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্যের ভাণ্ডার অনেক বেশি সমৃদ্ধ। গ্রামীণ জীবন প্রণালি, শস্য উৎপাদন, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, চিত্তবিনোদন ইত্যাদির প্রাণবন্ত ও প্রাকৃতিক রূপ আমাদের লোকজ ঐতিহ্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ভাণ্ডারে রয়েছে–

নকশিকাঁথা: বাংলার লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যমণ্ডিত ও নান্দনিক নিদর্শন হচ্ছে নকশিকাঁথা। সাধারণত পুরনো কাপড় দিয়ে কাঁথা সেলাই করে তার ওপর গ্রামবাংলার নারীরা বিভিন্ন ধরনের নকশা তোলেন নকশিকাঁথায়। গ্রামীণ নারীরা তাদের সুখ-দুঃখের নানা স্মৃতি তুলে ধরেন নকশিকাঁথার মাধ্যমে। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, খুলনা, রাজশাহী, যশোর, ফরিদপুর, পাবনা, দিনাজপুর, বগুড়াসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তৈরি করা হয় দৃষ্টিনন্দন নকশিকাঁথা। ব্যবহার ভেদে বিভিন্ন নামও রয়েছে নকশিকাঁথার। যেমন– গায়ে দেওয়ার কাঁথা, বিছানার কাঁথা, শিশুর কাঁথা, সুজনী কাঁথা, বর্তনী রুমাল কাঁথা, পালকর কাঁথা, বালিশের ঢাকনি, দস্তরখানা, পান পেঁচানী, আরশীলতা প্রভৃতি।

নকশি পাখা: নকশিকাঁথার মতোই নকশি পাখা বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্যের অন্যতম নিদর্শন। তালপাতা, সুপারির পাতা ও খোল, সুতা, পুরনো কাপড়, বাঁশের বেতি, নারিকেল পাতা, চুলের ফিতা, পাখির পালক ইত্যাদি অতি সাধারণ ও সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয় নকশি পাখা। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যখন বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগেনি, তখন থেকে গ্রীষ্মকালে শরীর ঠাণ্ডা করার অন্যতম প্রধান উপকরণ ছিল নকশি পাখা। বায়ুবন্দী, শঙ্খলতা, কাঞ্চনমালা, সজনে ফুল, কাঁকইর জালা, গুয়াপাতা, ছিটাফুল, তানাফুল, মনবিলাসী, মনবাহার, ষোলকুড়ির ঘর, মনসুন্দরী, লেখা, সাগবেদীসি, যুগলহাঁস, যুগল ময়ূর ইত্যাদি বিভিন্ন নামে নকশি পাখা রয়েছে গ্রামগঞ্জে। অনেক সময় নকশি পাখায় বুননের মাধ্যমে বিভিন্ন দোয়া ও প্রবাদ ফুটিয়ে তোলা হয়। যেমন– 'যাও পাখি বল তারে, সে যেন ভুলে না মোরে', 'দিন যায় কথা থাকে, সময় যায় ফাঁকে ফাঁকে' ইত্যাদি।

নকশি পিঠা: কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে নানা ধরনের পিঠা তৈরি করা হয়। নকশি পিঠা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম। পিঠার গায়ে নকশা এঁকে অথবা ছাঁচে ফেলে পিঠাকে চিত্রিত করে তৈরি করা হয় নকশি পিঠা। এটিকে মেয়েলি শিল্পও বলা হয় কারণ এর মাধ্যমে একান্তভাবে নারী মনের সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়। ষড়ঋতুর বাংলাদেশে বিভিন্ন মৌসুমে, উৎসব, পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা, বিয়ে-শাদি প্রভৃতি উপলক্ষে নানা স্বাদের ও ডিজাইনের নকশি পিঠা তৈরি করা হয়। এসব পিঠার রয়েছে আবার বিভিন্ন নাম। যেমন–চিরল পাতা, সজনে পাতা, কাজল পাতা, জামাইমুখ, কন্যামুখ, পাকন, বিবিখানা, শঙ্খলতা, কাজললতা, হিজলপাতা, সাগরদীঘি, সরপুস, চম্পাবরণ, জামাইমুচড়া, সতীনমুচড়া প্রভৃতি।

শীতলপাটি: আবহমান বাংলার লোক ঐতিহ্যের অনন্য স্মারক শীতলপাটি। ২০১৭ সালে ইন্টারগভার্নমেন্টাল কমিটি অব ইউনেস্কো বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী

শীতলপাটিকে (Traditional art of Shital Pati Weaving of Sylhet Bangladesh) ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ (আইসিএইচ) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি বাংলাদেশের জন্য বিরাট গৌরবের বিষয়। মুর্তা বা পাটি বেত বা মোস্তাক নামক গুল্মজাতীয় গাছের ছাল থেকে শীতলপাটি তৈরি করা হয়। সিলেটের বালাগঞ্জ, রাজনগর, বরিশালের স্বরূপকাঠি, ফরিদপুরের সাতৈর, নোয়াখালীর সোনাগাজী, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা প্রভৃতি স্থানে উন্নতমানের শীতলপাটি তৈরি করা হয়। শীতলপাটি মূলত মেঝেতে পাতা এক ধরনের আসন হলেও গ্রামে এটি মাদুর ও চাদরের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আবার শহরে শো-পিস, মানিব্যাগ, হাতব্যাগ, কাঁধে ঝোলানোর ব্যাগ, টেলিম্যাট প্রভৃতি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় শীতলপাটি।

মেলা: বাঙালির শত বছরের ঐতিহ্যের অন্যতম দাবিদার মেলা। সাধারণত বিশেষ কোনো দিন, উৎসব, পালা-পার্বণকে ঘিরে চলে এই মেলা। গ্রামীণ জনজীবনের জন্য মেলা একটি স্বাভাবিক উৎসবের রূপ। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাতেই নানা ধরণের মেলার প্রচলন রয়েছে। পহেলা বৈশাখ, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, বিজয়া দশমী, দশই মহররম, চৈত্র সংক্রান্তি, ফাল্গুন প্রভৃতি উৎসবকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ মেলা বসে। তবে উপলক্ষ যাই হোক না কেন বাঙালিদের নিকট মেলা খুব জনপ্রিয় ও আনন্দের দিন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এসে মিলিত হয় মেলায়। ভিড়, চেঁচামেচি, হট্টগোল, ঠেলাঠেলি, হাসি-কান্না, ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি, খুশির উচ্ছ্বাস আর রং-বেরঙের পোশাক– এ যেন প্রতিটি মেলার এক সাধারণ চিত্র।

নাগরদোলা, কাটামুণ্ড জোড়া লাগার জাদুবিদ্যা, তালপাতার বাঁশির রকমারি খেলনা, মণ্ডা-মিঠাইয়ের দোকান, জিলিপি খাওয়ার ধুম, পাঁপড় তেলেভাজার ঘ্রাণ, জামাকাপড়, হাঁড়ি-পাতিলের নানা রকমের পণ্যের পসরা সবই যেন মেলার বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে।

শখের হাঁড়ি: বাঙালি লোকজ এবং সামাজিক উৎসব-পার্বণে ব্যবহার করা হয় শখের হাঁড়ি। সৌখিন কাজে ব্যবহৃত হয় বলে এর নাম শখের হাঁড়ি। বাংলাদেশের সব জায়গায় পাওয়া গেলেও রাজশাহীর সিন্দুরকুসুম্বী, বাঁয়া, হরগ্রাম, বসন্তপুর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের বারোসরিয়া গ্রাম, ঝিনাইগাতি থানা, ঢাকার নয়ারহাট, কুমিল্লা, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী, ফরিদপুরের কোয়েলজুড়ি ও হাসরা, টাঙ্গাইলের কালিহাতি, জামালপুরের

বজরাপুর, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার ইদ্রিলপুর, ময়মনসিংহের বাঙ্গাসুর ইত্যাদি স্থান উল্লেখযোগ্য। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, সাদা, কালোসহ বিভিন্ন রং দিয়ে মাছ, পাখি, অর্ধস্ফুট পদ্ম, খড়কুটা, পাতা বিভিন্ন ডিজাইনের আলপনা আঁকা হয় শখের হাঁড়িতে।

মৃৎশিল্প: আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে এ শিল্প বিঘের গ্রামবাংলার অনেক পরিবার জীবিকানির্বাহ করে আসছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, দিনাজপুর, কক্সবাজার প্রভৃতি জেলার মৃৎ শিল্পীরা ঐতিহ্যগতভাবে মাটির জিনিসপত্র তৈরি করে আসছে। মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ হলো পরিষ্কার এঁটেল মাটি। তবে এঁটেল মাটি হলেই যে তা দিয়ে এই শিল্পের কাজ করা যাবে, তা কিন্তু নয়। এর জন্য দরকার অনেক যত্ন, শ্রম, হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। দেশের ঐতিহ্যবাহী মৃতশিল্পের মধ্যে রয়েছে– হাঁড়িপাতিল, কলসি, থানকি, চুলা, খেলনা, পুতুল, ঘরের টালি, পানি সেচের নালি, ধর্মীয় প্রতিকৃতি, প্রাণীজ প্রতিকৃতি, অলঙ্কার, শো-পিস প্রভৃতি।

পাটজাত পণ্য: বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যের মধ্যে অন্যতম হলো পাটজাত পণ্য। সাধারণত পাট দিয়ে বিভিন্ন রকমের শিকা, শতরঞ্জি, কার্পেট, সৌখিন হ্যান্ডব্যাগ, থলে, শো-পিস, শাড়ি, জুতা, স্যান্ডেল, ট্রে, গজ কাপড়, পোশাক ইত্যাদি তৈরি করা হয়। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে পাট ও পাটজাত পণ্য। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে এ খাত থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ৫১ কোটি ১৭ লাখ মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২১ দশমিক ৫৫ শতাংশ বেশি এবং লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ২৭ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ বর্তমানে আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বেনিন, ব্রাজিল, বুলগেরিয়া, কানাডা, চিলি, চীন, কঙ্গো, কোস্টারিকা, মিশর, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ইথিওপিয়া, গাম্বিয়া, জার্মানি, হাইতি, ভারত, আয়ারল্যান্ড, ইরান, জাপান, জর্ডান, কোরিয়া, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, মরক্কো, মিয়ানমার, নেদারল্যান্ড, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রুমানিয়া, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করছে।

বাঁশ ও বেত: লোকশিল্পের এক অনন্য নিদর্শন বাঁশ ও বেত শিল্প। বাংলাদেশে প্রায় ২৬ প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়। তার মধ্যে মুলিবাঁশ, তল্লাবাঁশ ও বইরা বাঁশ দিয়ে শিল্পকর্ম করা সহজ। আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র অনেক দীর্ঘস্থায়ী না হলেও লোকজীবনে ব্যবহারের বহুমাত্রিকতা ও প্রয়োজনের কারণে এই শিল্পকর্ম হাজার বছর ধরে টিকে আছে। বাঁশ ও বেতের তৈরি মোড়া, বেড়া, মাথাল, ওরা, ভার, মাছ ধরার চাই, খালুই, জুইতা, বর্শা, ঢাল, লাঠি, তীর, ধনুক, বল্লম, বাঁশি, পাল তোলা নৌকা এবং গরুর গাড়ির ছাদ বা ছই বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতির প্রতীক। ইদানীং নগর জীবনে বাঁশ ও বেতের তৈরি চেয়ার, টেবিল, দোলনা, বাস্কেট, ব্যাগ, ছাইদানি, ফুলদানি, প্রসাধনী বাক্স, ছবির ফ্রেম, আয়নার ফ্রেম, কলম, কলমদানি ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চা বাগানে চায়ের পাতা তোলার ঝুঁড়ি, খাসিয়াদের পান রাখার ঝুঁড়ি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ব্যবহৃত বাঁশের তৈরি গৃহস্থালি পাত্রসমূহ খুবই আকর্ষণীয়।

কাঁসা ও পিতল: এ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে কাঁসা ও পিতলের তৈজসপত্র ও বিভিন্ন সামগ্রী ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ঢাকার ধামরাই, সাভার, নবাবগঞ্জ, জামালপুরের ইসলামপুর, রংপুর, টাঙ্গাইল ও শরিয়তপুরে বংশ পরম্পরায় তৈরি হয়ে আসছে কাঁসা ও পিতলের তৈজসপত্র। বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরিতে তৈরি হয় পিতল ও কাঁসার পণ্য। দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে– বাসনকোসন, হাঁড়ি-পাতিল, গ্লাস-প্লেট, পানির জগ, বোল-বাটি, পট, কুপিবাতি, হুঁকা, সুরমাদানি, পানদানি, লবণদানি, বদনা, ছেনি, ট্রে, কলস, টিফিন ক্যারিয়ার ইত্যাদি। গৃহসজ্জার সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে– ফুলদানি, উইন্ড চাইম, গ্রামোফোন, ফটোফ্রেম, দাবার ছকসহ বিভিন্ন শো-পিছ। আবার বনের বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, হরিণ থেকে শুরু করে মাছ, ডলফিন, হাঙ্গর, তিমিসহ বাদ্যযন্ত্রের শো-পিছ, বিভিন্ন স্থাপনা ও যানবাহনের প্রতিলিপি তৈরি করা হয় ঘর সাজাতে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের সামগ্রীর মধ্যে ঘণ্টা, কাশি, করতাল, মূর্তি, তুলসিপত্র, পঞ্চপ্রদীপ, পুষ্পমালা, ঘটি, গোলাপজলের পাত্র, আগরদানির পাত্র উল্লেখযোগ্য। থিমভিত্তিক নকশা ছাড়াও ফুল-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা করা হয় কাঁসা ও পিতলের পণ্যে।

তাঁত: গ্রামবাংলার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্য হলো তাঁত। তাঁতের তুলা থেকে উৎপন্ন সুতা দিয়ে কাপড় বানানো হয়। খুব ছোটো আকারের হাতে বহনযোগ্য তাঁত থেকে শুরু করে বিশাল আকৃতির স্থির তাঁত লক্ষ করা যায়। আধুনিক বস্ত্র কারখানায় অবশ্য স্বয়ংক্রিয়

তাঁত ব্যবহার করা হয়। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ঢাকার মসলিন রোমে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। দেশের তাঁতিরা তখন বিভিন্ন ধরনের মসলিন তৈরি করত। এগুলোর মধ্যে তানজেব, সারবন্দ, বাদান, খোশ, এলেবেলে, তারাঙ্গম, কুমিস, তুর্য, নয়নসুখ, মলমল, আন্দি অন্যতম। মসলিন ছাড়াও বাংলাদেশে অন্যান্য মিহি সুতার কাপড় তৈরি করা হয়। সবনম ও আবে রাওয়াঁ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

জামদানি: বয়ন শিল্পে জামদানির ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত। বিশ্বজুড়ে খ্যাতি রয়েছে বাংলাদেশের জামদানির। কথিত আছে, মসলিন এবং জামাদানি সারাবিশ্বে উঁচুমানের বস্ত্র হিসেবে বিবেচিত ছিল প্রায় অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত। জামদানি মূলত মসলিনেরই অংশ। প্রাচীন আমলে উন্নতমানের জামাদানি তৈরি হতো ঢাকা, ধামরাই, সোনারগাঁ, বাজিতপুর, জঙ্গলবাড়ি প্রভৃতি স্থানে। বর্তমানে ঢাকা, সোনারগাঁ, আড়াইহাজার, নরসিংদী, মনোহরদীতে জামদানি তৈরি করা হলেও ডেমরার হাটকেই জামদানির প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র বলা চলে। প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রয়েছে জামদানির কদর। জামদানি বলতে সাধারণত শাড়িকেই বোঝানো হলেও প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্যবাহী নকশায় সমৃদ্ধ ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, ঘাগড়া, রুমাল, পর্দা, টেবিল ক্লথ সবই জামদানির আওতায় পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীতে জামদানি নকশার কুর্তা ও শেরওয়ানির ব্যবহার ছিল। নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন জামদানি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন– পান্না হাজার, দুবলি জাল, বুটিদার, তেরছা, জালার, ডুরিয়া, চারকোণা, ময়ূর প্যাঁচ, কলমিলতা, পুঁইলতা, কচুপাতা, কাটিহার, কলকা পাড়, আঙুর লতা, সন্দেশ পাড়, প্রজাপতি পাড়, দুর্বা পাড়, শাপলা ফুল, বামনলি, জুঁই বুটি, শাল পাড়, চন্দ্র পাড়, চন্দ্রহার, হংস, ঝুমকা, কাউয়ার ঠ্যাঙা পাড়, চালতা পাড়, ইঞ্চি পাড়, বিলাই আড়াকুল নকশা, কচুপাতা পাড়, বাড়গাট পাড়, করলাপাড়, গিলা পাড়, কলস ফুল, মুরালি জাল, কচি পাড়, মিহিন পাড়, কাঁকড়া পাড়, শামুক ঝুটি, প্রজাপতি বুটি, বেলপাতা পাড়, জবাফুল, বাদুড় পাখি পাড় ইত্যাদি।

পুতুল নাচ: এক সময় গ্রামবাংলার অন্যতম বিনোদনের আকর্ষণ ছিল পুতুল নাচ। গ্রামীণ জনপদে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বিনোদনে বিশেষ করে শিশুদের বিনোদনে পুতুল নাচ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে পুতুল নাচ হতো। বছরের বিশেষ সময়ে মেলায় পুতুল নাচ প্রদর্শন হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে বাঙালির ঐতিহ্যের এ অন্যতম দাবিদার প্রায় বিলুপ্ত।

লোক সংগীত: সংগীত রাজ্যের এক অন্যতম ধারা লোক সংগীত। এটি মূলত বাংলার নিজস্ব সংগীত। গ্রামবাংলার মানুষের জীবনের কথা, সুখ, দুঃখের কথা ফুটে ওঠে এই সংগীতে। অঞ্চলভেদে বাংলাদেশে প্রায় অর্ধশত লোক সংগীতের ধারা প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, মারফতি, বাউল, গম্ভীরা, কীর্তন, ঘাটু, ঝুমুর, বোলান, আলকাপা, লেটো, গাজন, বারমাসি, ধামালি, পটুয়া, সাপুড়ে, খেমটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মেয়েলি গীত, সহেলি গীত, হুদমা গীত প্রভৃতি গানগুলোতে গ্রামীণ নারীদের সুপ্ত চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

ঐতিহ্যবাহী খেলা: ক্রিকেট, ফুটবলের দৌরাত্মে হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী অনেক খেলা। যেমন– হাডুডু, নৌকা বাইচ, বউছি, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, নুনতা, চিক্কা, ডাংগুলি, ষোলোগুটি, মোগল-পাঠান, এক্কাদোক্কা, বউরানি, কড়িখেলা, কানামাছি, ঘুড়ি ওড়ানো, কবুতর ওড়ানো, মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, ছি-কুত-কুত, বলি খেলা, ইচিং বিচিং, ওপেন টু বাইস্কোপ, লাঠি খেলা, কাবাডি, টোপাভাতি, ফুল টোকা, মার্বেল খেলা, লাটিম, লুডু, রুমাল চুরি ইত্যাদি। হাজার রকমের এসব খেলা এক সময় বাংলার শহর ও গ্রামে অন্যরকম আনন্দ ও উদ্দীপনা তৈরি করত। এসব খেলা এখন হয়ত কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে, তবে বাংলার কিশোর-কিশোরীদের মাঠে-ঘাটে, পুকুরে, খেলার মাঠে দুরন্তপনা থেমে নেই।

বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্যের অনেক কিছুই শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে হারিয়ে যাচ্ছে। তবে এগুলো আমাদের বাঙালিদের একান্তই নিজের। এগুলো ইতিহাসে অন্যতম নক্ষত্র হয়ে থাকবে চিরকাল।

লেখক: প্রাবন্ধিক

২,৮০,৯৬৩টি নিবন্ধিত জেলে-পরিবারে চাল দিবে সরকার

দেশের ২০টি জেলার ৯৬টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত থাকা ২,৮০,৯৬৩টি নিবন্ধিত জেলে-পরিবারের জন্য প্রায় সাড়ে ২২ হাজার মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ করেছে সরকার। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় যা সম্পন্ন করবে সরকার। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানায়, গত ফেব্রুয়ারি মাসে উক্ত ভিজিএফ চাল সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুকূলে মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তা ৩১শে মার্চ ২০২০-এর মধ্যে সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ২০২০– এই দুই মাসের জন্য ভিজিএফের চাল প্রদান করা হচ্ছে।

বরাদ্দপ্রাপ্ত উপজেলাগুলো হলো– ঢাকা জেলার দোহার, মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয়, দৌলতপুর ও হরিরামপুর, রাজবাড়ি জেলার সদর, পাংশা, কালুখালী ও গোয়ালন্দ, শরীয়তপুর জেলার জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া ও গোসাইরহাট, মাদারীপুর জেলার সদর, কালকিনি ও শিবচর, ফরিদপুর জেলার সদর, মধুখালী, সদরপুর ও চরভদ্রাসন, মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর, শ্রীনগর, লৌহজং, টংগিবাড়ী ও গজারিয়া, ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, দৌলতখান, তজুমদ্দিন, লালমোহন ও মনপুরা, পটুয়াখালী জেলার সদর, কলাপাড়া, বাউফল, গলাচিপা, দুমকি, দশমিনা, মির্জাগঞ্জ ও রাঙাবালি, বরিশাল জেলার সদর, মুলাদী, হিজলা, বানারীপাড়া, উজিরপুর, বাকেরগঞ্জ, মেহেন্দিগঞ্জ, বাবুগঞ্জ ও গৌরনদী, পিরোজপুর জেলার সদর, মঠবাড়িয়া, ভান্ডারিয়া, ইন্দুরকানী, নেছারাবাদ, কাউখালী ও নাজিরপুর, বরগুনা জেলার সদর, পাথরঘাটা, আমতলী, বামনা, বেতাগী ও তালতলি, ঝালকাঠি জেলার সদর, রাজাপুর, নলছিটি ও কাঁঠালিয়া, চাঁদপুর জেলার সদর, হাইমচর, মতলব উত্তর ও দক্ষিণ, লক্ষ্মীপুর জেলার সদর, কমলনগর, রামগতি ও রায়পুর, ফেনী জেলার সোনাগাজী, নোয়াখালী জেলার সদর, হাতিয়া, সুবর্ণচর ও কোম্পানীগঞ্জ। চট্টগ্রাম জেলার সদর, বাঁশখালী, সীতাকুণ্ড, সন্দ্বীপ, আনোয়ারা ও মিরসরাই, বাগেরহাট জেলার সদর, মোরেলগঞ্জ, ফকিরহাট, মোংলা, কচুয়া, শরণখোলা ও রামপাল এবং সিরাজগঞ্জ জেলার সদর, কাজীপুর, চৌহালি, বেলকুচি ও শাহজাদপুর।

প্রতিবেদন: মোবিন হক

মৃত্যু পারেনি ছুঁতে

আসাদ চৌধুরী

(বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে)

সব আলো ধপ করে নিভে গেল
মুক্তির সড়ক, খোয়া গেল সবচেয়ে নিরাপদ
নিজের ঘরেই–
কত যে শতাব্দী আর সহস্রাব্দ জুড়ে
মলিন আঁচলে আগলে রাখা যে সঞ্চয়
ঢের ঢের আলোর নাচন,
স্বপ্নের স্মৃতির ভাঁজে ভাঁজে
সকল দেশের রানি হয়ে ওঠা
এভাবেই নিভে গেল...
পাঁচ পাঁচটি সন্তান
কেউ একবারও ছুঁতে পারল না যে শরীর
মৃত্যুও পারেনি ছুঁতে, বিশ্বাস করুন
শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে
ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস
গোর্কি, বন্যা, মহামারি–
এরকম ঢের ঢের বিবাদের অতি সূক্ষ্ম জাল ছিঁড়েফুঁড়ে
বাঙালি এসেছে,সামনের কাতারে
তোমার ছায়ার সাথে লেফটে থাকা
তোমার আড়ালে
দুর্জয় হিম্মত নিয়ে লড়াই করেছে
জয়ী হয়ে যখন মুক্তির জন্য
মনেপ্রাণে তৈরি
তখনই হারায় পথ।
এখন তোমার স্মৃতি
স্বপ্ন বোনে অবাধ মুক্তির–
বিপন্ন বিস্ময়ে জানি
তুমি আছ আমাদেরই পাশে
থাকবে চিরকাল।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু নেই

সোহরাব পাশা

তুমি তো ফিরবেই তোমার নিমগ্ন ছায়ার কাছে,
তোমার তো ফিরে আসা মানে স্বদেশের মৃত্তিকার
কাছে ফেরা, বঞ্চিত ও দুঃখী মানুষের কাছে ফেরা;
তুমি ফিরে এসেছ তোমার স্বপ্নময় পদ্মা, মেঘনা
যমুনা মধুমতির কাছে, রাত্রির ঘুম ভাঙানো
পাখির কাছে, ভোরের কাছে;
নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বাঁচার আর্তনাদ করেনি ঘাতকের কাছে
শুধু চেয়েছিলে তুমি তোমার লাশ যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়
বাংলার মাটিতে, তোমার বাংলাকে এতটাই ভালোবাসতে তুমি
মৃত্যুকূপ খোলেনি তার নৈঃশব্দ্য জানালা কপাট
তবে কী 'মৃত্যু'ও জেনে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মৃত্যু নেই
তাঁর নাম ইতিহাসের উজ্জ্বল শিরোনাম, অনিবার্য পাঠ সময়ের;
তুমি ক্ষিপ্র অন্ধকার সময়কে থামিয়ে দিয়েছ
তোমার জীবনের চেয়ে প্রিয় এই বাংলাদেশের জন্যে
ছিনিয়ে এনেছ সুবর্ণ সকালকে, একটি দেশের জন্যে
একটি লাল সূর্যের জন্যে, ভোরের হাওয়ার জন্যে
একটি তীব্র সুদীপ্ত পতাকার জন্যে;
বঙ্গবন্ধুর নাম চির অম্লান, দোল খাবে ওই পতাকায়
এ কথা কেবল ইতিহাসের নয়, ভূগোলেরও,
তুমি বার বার ফিরে আসবেই যেভাবে রাত্রি শেষে ফেরে উজ্জ্বল ভোর।

বৈশাখ বন্দনা

হাসান হাফিজ

স্বপ্নছবি নতুনের, আগামীর, প্রত্যয়ের, শুভতা-ঋদ্ধির,
মাঙ্গলিক বৈশাখে আবারো উদ্যমে হই অচঞ্চল স্থির
জীবন রাঙিয়ে তুমি এসে গেছ, ছন্দদোলা অনুভূত হয়
দূর হোক অকল্যাণ জরা গ্লানি প্রলম্বিত ভীতি পরাজয়
গতস্য শোচনা নাস্তি– আনো ঝঞ্ঝা বদলের, নতুন প্রলয়
নতুন বঙ্গাব্দে এসো ঐকতানে তৃষাতুর মননের সহজিয়া গান
বানকুড়ালির তোড়ে নিঃস্ব হোক ছেঁড়াখোঁড়া আর্তি অভিমান
তোমার উত্থান চাই চরাচরে সম্প্রীতির স্বর্ণরেণু আনন্দ ছড়াও
দরদি মমতাস্নিগ্ধ ভালোবাসা গাঙে তুমি ভরসা ডিঙি নাও
আপন প্রভায় তুমি আলোকিত নিঃসংশয় করো প্রাণমন
বৈশাখ সুবন্ধু সখা প্রাণে প্রাণে হর্ষগীত সুকৃতি-স্বনন।

আকুল করা প্রাণ

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

পিতা তুমি, জাতির পিতা
তোমার দিকে তাকালে দেখি–
বনরাজ্যে বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থ তুমি–
তোমার জন্য বাঙালি পেল স্বাধীন মাতৃভূমি।
হিমালয়ের কথা মনে হলে–
তোমাকে দেখি– তুমি গিরিরাজ,
তোমার অনুরণন পেয়ে
গিরি সারি হাস্যোজ্জ্বল আজ।
নীল আকাশে তাকালে দেখি–
আকাশের মতো উদার তুমি, কুসুমের মতো কোমল,
আষাঢ়ের বজ্রের মতো কঠোর তুমি–জলের মতো তরল।
শীলার মতো কঠিন তুমি–
ন্যায়ের প্রতি অনঢ়
সত্যের প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
অন্যায়ের এক প্রতিবাদী স্বর
সত্যের জন্য তুমি এক নির্ভীক,
তোমার ছায়ায় রয়েছে ঢাকা বাংলার চতুর্দিক।
স্বাধীনতাকামী মানুষের মুক্তি তুমি–সংগ্রামী জনতার বীর
সূর্যের মতো তেজ তোমার যুধিষ্ঠিরের মতো ধীর।
ঝরনার মতো স্বচ্ছ সরলতা তোমার
হৃদয় তোমার মহাসমুদ্রের মতো,
অসত্যের প্রতি তুমি অর্জুনেরই বান
একাত্তরে রেসকোর্সে গাইলে তুমি–এক অবিনাশি গান।
প্রজাপতির মতো– অঙ্গ ভূষণ তুমি সুন্দরের পূজারী
কুসুমের মতো ভুলে আত্মপর সুবাসিত করে গেলে ধরণী।
শরতের শিশির সিক্ত শেফালীর মতো স্নিগ্ধ তোমার হাসি,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি তোমাকে ভালোবাসি।
সৌরভে তুমি রজনীগন্ধা, বিলিয়ে গেলে ঘ্রাণ
বাঙালিদের প্রাণপুরুষ, আকুল করা প্রাণ।

বাংলা বর্ষপঞ্জির সংস্কার

সাবিত্রী রানী

নববর্ষ বাঙালির প্রাণের সর্বজনীন উৎসব। বাংলা নববর্ষ শুরু হয় পয়লা বৈশাখে। এ দিনে অতীত দুঃখ গ্লানি ভুলে নতুন আশায় নতুন বছরকে বরণ করা হয়। পয়লা বৈশাখ বঙ্গাব্দের প্রথম দিন।

বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের সূচনা সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদদের নানা মত রয়েছে। তবে বহুল প্রচলিত মতের প্রথমটি হলো– বাংলা সনের প্রচলন করেন সম্রাট আকবর। সে সময় চান্দ্র মাসের হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে সকল কাজকর্ম পরিচালিত হতো। চান্দ্র বছর সৌর বছরের চেয়ে ১০/১১/১২ দিন কম হওয়ায় ঋতুনির্ভর চাষাবাদ ও অন্যান্য প্রধান কার্যক্রমের সমন্বয় ঘটানোর জন্য সম্রাট আকবরের অনুরোধে তাঁর সভাসদ জ্যোতির্বিদ ফতেউল্লাহ সিরাজী চান্দ্র ও সৌর বৈশিষ্ট্যে সমন্বিত সনের কাঠামো নির্দেশ করে দেন। পরবর্তীতে সে কাঠামো-সূত্র অবলম্বন করে আঞ্চলিক অধিপতিরা উড়িষ্যার আমলি সন, বিলায়েতি সন, সুরাসানি সনের মতো বিভিন্ন আঞ্চলিক সন চালু করেন। এগুলোকে বলা হতো ফসলি সন। বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের মতে, মোগল আমলে বাংলার গভর্নর মুর্শিদ কুলি খান এ রীতি অবলম্বন করে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় ইলাহি সন ও হিজরি সন থেকে বঙ্গাব্দ ছিল ভিন্ন ও স্বকীয় একটি পঞ্জিকা। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে আকবরেরও আগে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার সুলতান আলা-উদ্-দীন হুসাইন শাহের আমলে বাংলা সনের প্রচলন হয়। আবার অনেক পণ্ডিতের মতে প্রাচীন বঙ্গদেশীয় রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক চালু হয় বঙ্গাব্দ।

বাংলা সন একবারেই স্বকীয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ২৪টির মতো সন ছিল। সেসব সন রাজা-বাদশাহর (গুপ্তাব্দ, লক্ষণাব্দ, জালালি সন) ধর্ম বা সীমিত অঞ্চলের (হিজরি, খ্রিষ্টাব্দ, ত্রিপুরাব্দ), কিন্তু বাংলা সন বাংলাদেশ ও বাঙালির জাতিসত্তার পরিচয়জ্ঞাপক। তাই এ সন বাঙালির এত প্রিয়, জনজীবনে এত গুরুত্ববহ।

ভারত উপমহাদেশে আধুনিককালে ব্যাপকভিত্তিক পঞ্জিকার ইতিহাস পুনর্গঠন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহাকে প্রধান করে ভারত সরকার প্রথম ভারতীয় পঞ্জিকা সংস্কারের দায়িত্ব প্রদান করেন। সাহা কমিটি ভারতের অন্য সনসহ বাংলা সনের সংস্কার বিষয়েও তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে। ১৯৫৪ সালে প্রস্তাব পেশ করেন। ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৫৭ সালে ড. মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বাধীন বর্ষপঞ্জির সংস্কার কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেন। এ কমিটির সুপারিশ যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় ভারত সরকার আশির দশকে অধ্যাপক এস পি পান্ডের সভাপতিত্বে আরেকটি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি করে। পান্ডে কমিটিও সাহা কমিটিকে মূল ধরে ১৪ই এপ্রিলকে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন, অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ হিসেবে নির্ধারণ করে সংস্কার প্রস্তাব পেশ করে। তখন পশ্চিম বঙ্গের সরকারও বাংলা বর্ষপঞ্জির কিছু সংস্কার করেন। তবে, এক্ষেত্রে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেন ভারতের সনাতনপন্থি পঞ্জিকাকারগণ। তাঁরা সংস্কার গ্রহণ করেননি এবং প্রাচীন পদ্ধতিতেই পঞ্জিকা প্রণয়ন অব্যাহত রাখেন।

বাংলা পঞ্জিকা সংস্কারের প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের পণ্ডিত ও সুধী মহলেও। প্রথম থেকেই বাংলা বর্ষপঞ্জি সংস্কারে ভূমিকা নেয় বাংলা একাডেমি। বাংলা বর্ষপঞ্জিকার আরও সংস্কারের জন্য ১৯৬৩ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে 'বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার' নামে একটি কমিটি করে বাংলা একাডেমি। এটি 'শহীদুল্লাহ কমিটি' নামে পরিচিতি পায়। এই কমিটি মেঘনাদ সাহার সুপারিশকে সামনে রেখেই কিছু সংযোজন-বিয়োজনের মধ্য দিয়ে তাদের সুপারিশ পেশ করে। কমিটির মূল সুপারিশগুলো ছিল– (১) বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত ৩১ দিন এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত প্রতিমাস ৩০ দিন গণনা। (২) অধিবর্ষে (লিপ ইয়ার) ১ দিন বৃদ্ধি পেয়ে চৈত্রমাস ৩১ দিনে গণনা।'

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সরকারি নথিতে বাংলায় নোট লেখার পাশাপাশি বাংলায় স্বাক্ষর ও তারিখ লেখার নিয়ম করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে এই নিয়ম আরও জোরদার করেন। ১৯৮৭ সাল থেকে এই নিয়ম বাধ্যতামূলক করে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে শহীদুল্লাহ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে এর ভিত্তিতে বাংলা দিনপঞ্জিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু অধিবর্ষ গণনার ক্ষেত্রের জটিলতার বিষয়টি দেখা যায়। তখন শহীদুল্লাহ কমিটির সুপারিশ সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে।

লিপ ইয়ার সংক্রান্ত শহীদুল্লাহ কমিটির কিছু অস্পষ্টতা ও সংশ্লিষ্ট অন্য জটিলতা নিরসনসহ বর্ষ পঞ্জিকাকে আরও বিজ্ঞানভিত্তিক করার জন্য তৎকালীন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হারুন-উর-রশিদকে প্রধান করে পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, ভাষা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই কমিটি সুপারিশ করে, যা বাংলা একাডেমির ১৪০১ সনের ২৮শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪) তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদে অনুমোদন লাভ করে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো ছিল–আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বাংলা মাস ও ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে গ্রামবাংলার মানুষের সম্পৃক্ততার কথা স্মরণে রেখে এবং বাংলা বর্ষপঞ্জি প্রণয়নের জন্য শহীদুল্লাহ কমিটির কাছ

থেকে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করে কমিটি প্রচলিত বর্ষপঞ্জির নিম্নরূপ সংস্কার সুপারিশ করছে। প্রথম ধাপে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ: (১) সাধারণভাবে বাংলা বর্ষপঞ্জির বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত প্রতিমাস ৩১ দিন এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রতিমাস ৩০ দিন গণনা করা হবে; (২) গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির অধিবর্ষে যে বাংলা বছরের ফাল্গুন মাস পড়বে, সেই বাংলা বছরকে অধিবর্ষ গণ্য করা হবে; এবং (৩) অধিবর্ষে ফাল্গুন মাস ৩১ দিনে গণনা করা হবে।' এছাড়া কমিটি গুরুত্ববহ মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১লা বৈশাখকে প্রতিষঙ্গিক গ্রেগরীয় বছরে ১৪ই এপ্রিলকে বাংলা সনের ১ম দিন হিসেবে ধার্য করে এবং তারিখ পরিবর্তনের সময় হবে আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে রাত ১২টায়। এর উল্লেখযোগ্য ছিল চৈত্র মাসের পরিবর্তে ফাল্গুনকে অধিবর্ষের মাস হিসেবে নির্ধারণ করা। গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জিতে যে বছর ফেব্রুয়ারি মাস অধিবর্ষ হবে, সেই বছর বাংলা বর্ষপঞ্জিকায় ফাল্গুন মাস ৩০ দিনের পরিবর্তে হবে ৩১ দিন। এখন পর্যন্ত এই নিময় অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে এরপরও জাতীয় দিবসগুলোয় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ও বাংলা বর্ষপঞ্জি মূলানুগ হচ্ছে না। আর অধিবর্ষ গণনার ক্ষেত্রেও জটিলতা পুরোপুরি নিরসন হয়নি।

বাংলা বর্ষপঞ্জির বিদ্যমান অসামঞ্জস্য দূর করে পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং জাতীয় দিবসগুলোকে মূলানুগ করতে এবার তৃতীয়বার সংস্কার কমিটি করা হয়েছে। বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানকে সভাপতি করে ২০১৫ সালে এই কমিটি করা হয়। এতে সদস্য হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক অজয় রায়, পদার্থবিজ্ঞানী জামিল চৌধুরী, অধ্যাপক আলী আসগর, একাডেমির পরিচালক অপরেশ কুমার ব্যানার্জি প্রমুখ।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় যখন মাতৃভাষার দাবিতে মিছিল নিয়ে ছাত্র-জনতা বেরিয়ে এসেছিল, বাংলা বর্ষপঞ্জির পাতায় দিনটি ছিল ৮ই ফাল্গুন। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়, বর্ষপঞ্জিতে সেটা পড়ে ৯ই ফাল্গুন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের দিনটা ছিল পয়লা পৌষ। ২০১৯ সালে দিনটি পড়েছে দোসরা পৌষে। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে বাংলা বর্ষপঞ্জির বিশেষ দিনগুলোর এই ব্যত্যয় দূর করতে সংস্কার করা হয়েছে প্রচলিত বাংলা বর্ষপঞ্জি। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে বাংলা বর্ষপঞ্জির তারিখগুলোর সমন্বয় করাই এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য।

বাংলা বর্ষপঞ্জি পরিবর্তনের কাজটি করেছে বাংলা একাডেমির গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ। এ বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন বিবিসিকে সাক্ষাৎকারে বলেন, '২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৬ই ডিসেম্বর, ২৬শে মার্চের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবসসমূহ বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যে দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই দিনে পালন করা হবে। যেমন ২১শে ফেব্রুয়ারি, যা এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যা বিশ্বব্যাপী পালিত হয়, ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে নামা মিছিলে গুলি চালানোর সেই ঘটনা ঘটেছিল বাংলা আটই ফাল্গুনে। কিন্তু বছর ঘুরে অধিকাংশ সময়ই এখন ২১শে ফেব্রুয়ারি গিয়ে পড়ে নয়ই ফাল্গুনে, যা নিয়ে বিভিন্ন সময় লেখক, কবি, সাহিত্যিকসহ অনেকে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, একইভাবে বাংলাদেশের বিজয়দিবস ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালের ঐ দিনটি ছিল পয়লা পৌষ, কিন্তু বাংলা পঞ্জিকায় দিনটি পড়ত দোসরা পৌষ। আবার রবীন্দ্রজয়ন্তী ও নজরুলজয়ন্তী এবং তাঁদের মৃত্যুদিনও বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী যে দিনে হয়েছিল, তার সঙ্গে গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির দিন মেলে না। কিন্তু নতুন নিয়মে দুই বর্ষপঞ্জির মধ্যে দিন গণনার সমন্বয় করা হয়েছে।'

বাংলাদেশে নতুন বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী বাংলা বছরের প্রথম ছয় মাস– বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস ৩১ দিনে হবে। এখন ফাল্গুন মাস ছাড়া অন্য পাঁচ মাস ৩০ দিনে পালন করা হবে। ফাল্গুন মাস হবে ২৯ দিনের, কেবল অধিবর্ষের (লিপ ইয়ার) বছর ফাল্গুন ৩০ দিনের মাস হবে।

এই পরিবর্তন ১৪২৬ বঙ্গাব্দের প্রথম দিন থেকে চালু হয়েছে। নতুন করে পরিবর্তন আনার জন্য ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমি সংস্থাটির তৎকালীন মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। বাংলা দিনপঞ্জিকার এই সংস্কার সম্পর্কে বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান দৈনিক প্রথম আলোকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'বহুদিন থেকেই দিনপঞ্জির সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। আমরা বিজ্ঞান ভিত্তিতে এই সংস্কার করেছি। কিন্তু ভারতে এটা করা হয়নি। মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানীর প্রস্তাব ভারত গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে দুই বাংলায় দুই রকম দিনপঞ্জির ব্যবহার হবে। আমরা আমাদের দিনপঞ্জিকার আধুনিকায়ন করে জাতীয় দিবসগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করতে পেরেছি, এটা আমাদের একটা বড়ো অগ্রগতি।'

বাংলাদেশের জাতীয় ঘটনাবলির সঙ্গে সমন্বিত বাংলা একাডেমি কর্তৃক সর্বশেষ সংস্কৃত বাংলা বর্ষপঞ্জি ১৪২৬ বঙ্গাব্দ থেকে চালু হয়েছে। ব্যবহারোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত এই বর্ষপঞ্জি ব্যবহারে আমাদের আন্তরিকতা বাড়াতে হবে। বাংলা বর্ষপঞ্জির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণই হোক আমাদের নববর্ষের অঙ্গীকার। শুভ নববর্ষ।

লেখক: শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক

শব্দ দূষণ ও তার প্রতিকারে করণীয়

শোভা রহমান

পৃথিবীর শব্দ বৈচিত্র্য কতই না সুন্দর। অথচ শব্দকে অস্বাভাবিক রকম বাড়িয়ে উৎকট আওয়াজে পরিণত করে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের কাছে অসহ্য কষ্ট আর যন্ত্রণার কারণ করে তোলে একদল কাণ্ড জ্ঞানহীন মানুষ। এই উচ্চ মাত্রার শব্দ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তাই এর দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়। এই প্রকার দূষণ হলো শব্দের দূষণ।

বর্তমান যুগে গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে শব্দ দূষণ। যদিও শব্দ এক প্রকার শক্তি। শব্দ হলো মুখ থেকে উচ্চারিত এক প্রকার আওয়াজ। শব্দ ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। কারণ মনের ভাব আদান-প্রদান করার প্রধান উৎস হচ্ছে ধ্বনি যা এক প্রকার শব্দ। বলতে গেলে এই প্রাকৃতিক শক্তির কার্যপ্রণালি একমুখী নয় বরং বহুমুখী। শব্দের যেমন রয়েছে সুফল তেমনি রয়েছে নানামুখী কুফল। শব্দ যখন মানুষের সহনীয় পর্যায়ে থাকে তা হলো শব্দ আর অসহনীয় হলে তা শব্দ দূষণ। কিন্তু শব্দের উচ্চ তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতার কারণে আমরা নানা সময় বিরক্তবোধ করি অসস্তির মধ্যে পড়ি। শব্দের এই তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতাই আমাদের শরীরে ক্ষতির সৃষ্টি করে।

২০ থেকে ২০,০০০ হার্জের কম বা বেশি শব্দ মানুষের শ্রবণ সীমার বাইরে। তাই মানুষের জন্য শব্দ দূষণ প্রকৃতপক্ষে উক্ত সীমার অভ্যন্তরীণ তীব্রতর শব্দের দ্বারাই ঘটে থাকে। শব্দ দূষণ বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। শব্দ দূষণের মূল উৎসগুলো হচ্ছে– মোটর গাড়িগুলোর হাইড্রোলিক হর্ন বাজানো, প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত যানবাহন, বাজি পটকার আওয়াজ, লোকালয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান, রেডিও-টেলিভিশনের আওয়াজ, লাউড স্পিকারে মিউজিক, অডিও, ভিডিও চালানো, মাইকের যথেচ্ছ ব্যবহার, জেনারেটর ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের ব্যবহার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বজ্রপাতের শব্দ ইত্যাদি। এসকল উৎস থেকে উৎপন্ন শব্দ তীব্র দূষণের উৎপত্তি ঘটায়। শব্দ দূষণের নানামুখী প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশে শব্দ দূষণ জন জীবনে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলছে।

সকল শব্দ দূষণই মানুষের শরীর ও মনে কম-বেশি প্রভাব ফেলে। অনবরত ৬০ ডেসিবল এর বেশি শব্দ শুনতে থাকলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। শব্দ দূষণের ফলে মানুষের বধির হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। শরীরে উচ্চ রক্তচাপের সৃষ্টি হয়। হৃদযন্ত্রের রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। এমনকি যাদের হার্টের রোগ রয়েছে উচ্চ মাত্রার শব্দ দূষণে তারা হার্ট অ্যাটাকে মারাও যেতে পারেন। মাথা ব্যথা ও মানসিক উত্তেজনা বেড়ে যায়। অতিশব্দে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। এমনকি প্রচণ্ড শব্দে মানুষ বিকলাঙ্গও হয়ে পড়ে। আর শব্দের দূষণ শুধু মানব সমাজের উপরই খারাপ প্রভাব ফেলে না অন্যান্য প্রাণীদের জন্যও শব্দ দূষণ মারাত্মক ক্ষতিকর। বন্য পরিবেশে শব্দ দূষণ বন্য প্রাণীদের শিকারের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাখিদের প্রজননে অসুবিধা করে ইত্যাদি।

আমাদের জনজীবনে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে আমাদের চারপাশের শব্দ দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে। নইলে আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নানা রোগে আক্রান্ত হবে বিশেষ করে বধির হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যাবে। একজন সুস্থ্য মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতা ৪৫ ডেসিবেল বা তার চেয়েও কম। কিন্তু আমাদের চারপাশের শব্দের মাত্রা আমাদের শ্রবণ ক্ষমতার উর্ধ্বে। এই সমস্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা মাথায় রেখে আমরা যদি বিবেকসম্পন্ন সক্রিয় নাগরিকের ভূমিকা পালন করি তাহলে শব্দ দূষণের সমস্যা অনেকাংশেই সমাধান সম্ভব।

শব্দ দূষণ প্রতিকারের জন্য বেশ কিছু উপায় মেনে চলা যেতে পারে। যথা:

১. উচ্চ শব্দে মাইক, টেলিভিশন ও রেডিও বাজানো পরিহার;

২. যানবাহনে হাইড্রোলিক হর্ন পরিহার;

৩. শব্দ দূষণ আইন, ২০০৬-এর যথার্থ পালন;

৪. শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানিয়ে জনসচেতনতা তৈরি করা;

৫. কলকারখানা আবাসিক এলাকা থেকে দূরে স্থাপন;

৬. বিদ্যুৎ চলে গেলে জেনারেটরের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক আইপিএস ব্যবহারসহ সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার;

৭. অনুষ্ঠান ব্যতীত বাজি-পটকা না ফোটানো;

৮. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ব্যবহার পরিহার;

৯. অত্যধিক শব্দপ্রবণ অঞ্চলে কানে শব্দ প্রতিরোধকযন্ত্র ব্যবহার করে কাজ করা ইত্যাদি।

একজন সুনাগরিক হতে হলে শুধু নিজের না অন্যের জন্যও ভাবতে হবে। শব্দ দূষণ সম্পর্কে শুধু নিজে সচেতন হলেই হবে না তা সম্পর্কে অন্যকে জানাতে এবং সচেতন করে তুলতে হবে। আর এর জন্য সরকার প্রতিবছর ২৭শে এপ্রিল আন্তর্জাতিকভাবে শব্দ সচেতনতা দিবস পালন করে আসছে। মূলত সর্বস্তরের মানুষদের মাঝে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য দিবসটি প্রতিবছর পালিত হয়। বাংলাদেশ সরকার এ নিয়ে প্রতিনিয়ত হরদম কাজ করে চলেছে। শহর-নগর-বন্দর সর্বত্র মানুষ শব্দ দূষণের শিকার। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার করেছে আইন এবং এতে শাস্তির বিধানও রয়েছে। তাই চাই শব্দ দূষণ রোধে, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৬-এর যথাযথ পালন আর জনসচেতনতা। শব্দ দূষণ নামক মারাত্মক ক্ষতিকর এই নীরব পরিবেশ দূষণরোধে জনমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়তে পারলেই কেবল সুখী ও সুস্বাস্থ্যসম্মত দেশ গড়তে আমরা সক্ষম হবো।

লেখক: প্রাবন্ধিক

চলচ্চিত্র নির্মাণের একাল-সেকাল

জেসিকা হোসেন

বদলে গেছে সময়, বদলে গেছে মানব জীবনের ধরন। এরই সাথে বদলে গেছে মানুষের বিনোদনের ধরনও। বর্তমান সময়ের বিনোদনের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম হচ্ছে চলচ্চিত্র। ছায়াছবি, সিনেমা, মুভি বা ফিল্ম, এগুলো চলচ্চিত্র শব্দেরই প্রতিশব্দ। চলচ্চিত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ। যে সংস্কৃতিতে তা নির্মিত হয় তাকেই প্রতিনিধিত্ব করে চলচ্চিত্রটি। শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই নয়, শিক্ষার অন্যতম সেরা উপকরণ হিসেবে চলচ্চিত্র প্রসিদ্ধ।

চলচ্চিত্র যোগাযোগেরও অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম। মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সিনেমার বিকল্প নেই। সিনেমা যেমন মানুষকে নির্মল বিনোদন দেয়, তেমনি জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা ও জানার জগতকে প্রসারিত করে। গতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণ, সামাজিকীকরণ, নীতি-নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা, মানুষকে উজ্জীবিত করা, সত্য সুন্দর প্রকাশে চলচ্চিত্রের অবদান অসামান্য।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে ভিজ্যুয়াল বিশ্বের সমন্বয় থাকায় সাধারণ মানুষের সাথে সবচেয়ে ভালো যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। শিল্পকলার প্রভাবশালী এই মাধ্যমকে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য, ত্রাণ ও দুর্যোগ কল্যাণমন্ত্রী থাকা অবস্থায় ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (এফডিসি) গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এরপরে এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হলে এর সহযোগিতায় ১৯৫৯ সাল থেকে প্রতিবছর চলচ্চিত্র মুক্তি পেতে থাকে। ৩রা এপ্রিল বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন(বিএফডিসি) প্রতিষ্ঠা দিবস বর্তমান সরকারের অবদান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালে চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই সূত্রে ২০১২ সাল থেকে সরকারিভাবে এই বিশেষ দিনটিকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

গতিই জীবন, স্থিতিই মৃত্যু। বিএফডিসি প্রতিষ্ঠার পর থেকে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কারিগরি ও বাণিজ্যিকভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সুবাদে সময়ের পরিবর্তনে চলচ্চিত্র জগতে এসেছে নানা পরিবর্তন। সংযোজন এবং বিয়োজন হয়েছে অনেক কিছুই। বদলে গেছে চলচ্চিত্রের কাহিনি, যান্ত্রিক দিক, নান্দনিকতার, বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপট, দর্শকের ধরন, শিল্পী এবং কলাকুশলী অনেক কিছুই।

পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণের কোনো সুযোগ ছিল না। কোনো বাঙালির যদি চলচ্চিত্র নির্মাণের সাধ জাগতো তবে নেগেটিভ নিয়ে যেতে হতো পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে। আবার প্রক্রিয়াকরণ শেষে আনতে গেলেও লাগতো কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স। চলচ্চিত্র আর কলকারখানা সবই ঐ পশ্চিম পাকিস্তানে। কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে তোলা হয়েছিল ফিল্ম স্টুডিও। অথচ এদেশে কিছুই ছিল না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নজরে এল যে বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সুযোগের অভাব। তাঁর বদৌলতে আজ বাংলা চলচ্চিত্র এত বিকাশ লাভ করেছে।

বিএফডিসি বর্তমানে বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা একটি স্বায়ত্বশাসিত সরকারি সংস্থা। এটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। এই সংস্থার সাহায্য নিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্নে এ সংস্থা সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বছরে গড়ে ৪/৫টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মুক্তি পেত। চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অনেক যোগ্য ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। তাঁরা হলেন– জহির রায়হান, আলমগীর কবির, আজিজুর রহমান, ঋত্বিক ঘটক, তানভীর মোকাম্মেল, খান আতাউর, তোজাম্মেল হক বকুল, দীলিপ সোম, চাষী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন আহমেদ, আবদুল্লাহ আল মামুন-এর মতো বিখ্যাত ব্যক্তিগণ। যারা জাতিকে উপহার দিয়েছেন কালোত্তীর্ণ সব চলচ্চিত্র। তাদের তৈরি ছবি পেয়েছিল দর্শক জনপ্রিয়তা এবং ব্যবসায়িক সফলতা অর্জন করেছে।

১৯৫৭ সালে স্থাপিত পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ইপিএফডিসি) সংস্থার অধীনে তখন ছিল চলচ্চিত্র স্টুডিও ও ল্যাবরেটরি।

স্বাধীনতা লাভের পর এ সংস্থাটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত আট সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে এ সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে এফডিসিতে রয়েছে প্রশাসন ও অর্থ, উৎপাদন এবং প্রকৌশল বিভাগ।

চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে–

১.চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং স্টুডিও প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানিকে ঋণ দান;

২.চলচ্চিত্র স্টুডিও নির্মাণের জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে ঋণ দান;

৩.নিজস্ব স্টুডিও স্থাপন এবং চিত্র নির্মাতাদের ভাড়ার বিনিময়ে স্টুডিও ব্যবহারের সুযোগ দান;

৪.চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্প প্রণয়ন;

৫.চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সিনেমাটোগ্রাফ, ফিল্ম ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং কাঁচামাল আমদানি এবং

৬.চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ।

এফডিসি হচ্ছে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংস্থার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে সংস্থার অধীনে রয়েছে ৯টি শুটিং ফ্লোর, ১২টি শুটিং ইউনিট, ৩টি সাউন্ড থিয়েটার, রঙিন ও সাদাকালো ছবির জন্য ল্যাবরেটরি, ১৫টি এডিটিং মেশিন, অপটিক্যাল মেশিন, মুভি ক্যামেরা, বিভিন্ন ধরনের লাইট, ব্যাক প্রজেকশন মেশিন, পুকুর, কৃত্রিম হ্রদ, জেনারেটর, ভ্যান ইত্যাদি।

এছাড়াও চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রযোজনা, পরিবেশনায় অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন, নতুন শিল্পীর সন্ধান, চলচ্চিত্র উৎসব ও সেমিনারের আয়োজন, বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য ছবি বাছাই উৎসবে অংশগ্রহণ, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার কমিটি, ফিল্ম সেন্সরবোর্ড, অনুদান কমিটি চলচ্চিত্র নীতিমালা প্রণয়ন কমিটিতে অংশগ্রহণ, প্রকাশনা এবং চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে জড়িত থাকে।

এ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে বর্তমানে মানুষ ডিজিটাল ছবির আনন্দ পাচ্ছে। বর্তমানে মানুষ থ্রিডি ছবির স্বাদ গ্রহণ করছে। এসব চলচ্চিত্রের মধ্যে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়ে পুরস্কার ও প্রশংসা পেয়েছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

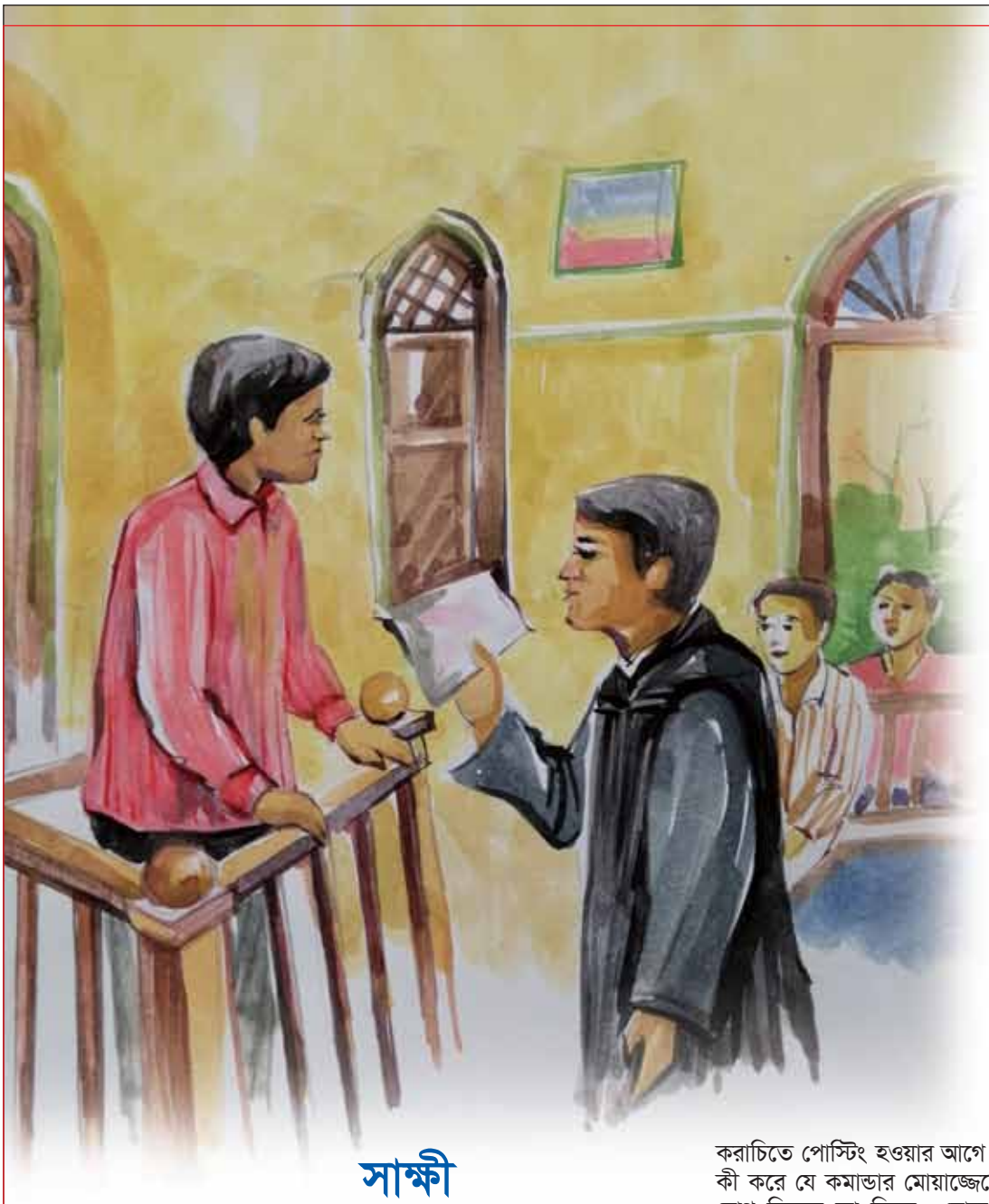

সাক্ষী

সাহিদা বেগম

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিক, জুলাই মাস চলছে। রোদের তীব্রতা দেখে মাসের হিসেব করতে লেগেছেন আমির হোসেন মিয়া। এই মামলার তিন নম্বর সাক্ষী। সরকারি সাক্ষী, রাজসাক্ষী। গরমে হাসপাস করে আবার বাইরের দিকে তাকান। উহু! কী রোদ! বিন্নিধানের খইয়ের মতো সাদা ধবধবে রোদ। ভালো করে দেখেন, রোদটা কী সত্যি এতো সাদা! নাকি সামনের সাদা রঙের দালান বাড়িটার দেয়ালে লেগে রোদ এতো সাদা দেখাচ্ছে! হতে পারে। নাকি চোখের ভ্রম! না তা কেন? চোখেতো তার কোনো সমস্যা নেই। এ বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আমির হোসেন মিয়া বেশ সুস্থ এবং সবল দেহের অধিকারী। রোগ বালাই তেমন নেই। গত ক' মাস ধরে একটা সমস্যায় তিনি জড়িয়ে আছেন, তবে সেটা মানসিক। একটা মামলা নিয়ে। গুরুতর মামলা। রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা। শেষমেষ রাজসাক্ষী হয়ে বাঁচতে পারবেন তো! নাকি আরো জীবনঘাতি কাজ করলেন রাজসাক্ষী হয়ে! মামলার গতি যেভাবে আসামিদের পক্ষে যাচ্ছে, সরকার জিততে পারবেতো! না হলে তো নিশ্চিত মৃত্যু। মৃত্যুদণ্ড নয়। মামলার আসামিদের হাতেই মৃত্যু। হত্যা করবে তাকে। হত্যার কাজই অবশ্য তিনি করেছেন। তিনিতো শেখ মুজিবুর রহমানকে চেনেনই না। আসামীদের সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি যে ভুলটা করেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য। কাঠগড়ায় ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ৩৫ জন আসামীর মধ্যে টমাস উইলিয়াম শেখ মুজিবকে সনাক্ত করতে বললে, তিনি সার্জেন্ট জহিরুল হককে দেখিয়ে বললেন, ইনিই শেখ মুজিব। হায়! হায়! কী ভুল! কী ভুল! সারা আদালত কক্ষে একটা হাসির রোল পড়ে গিয়েছিল। আর ভুল হবে না কেন? ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। তিনিতো দেখেননি কখনো শেখ মুজিবুর রহমানকে। শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক নেতা আর তিনি আমির হোসেন মিয়া, খুবই নিম্ন পদস্থ একজন সৈনিক। পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর সৈনিক। তিনি কখনো রাজনীতি করেননি। রাজনীতি কী জিনিস তাও বোঝেন না। খুব ছোটোবেলায় নোয়াখালী জেলার সোনাইমুরি গ্রাম থেকে এসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরি পেয়ে যান। তারপর করাচি। করাচিতে পোস্টিং হওয়ার আগে কাবুল সেনা ছাউনিতে। তারপর কী করে যে কমান্ডার মোয়াজ্জেমের পাল্লায় পরে বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিলেন তা নিজেও বোঝেননি। গভীরভাবে ভেবে দেখার সুযোগও পাননি। কী করে যে বাঙালি জাতিসত্তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই বিপ্লবী সংগঠনে জড়িয়ে পরলেন। তাছাড়া তিনিতো শেখ মুজিবকে ফাঁসানোর জন্যে বিপ্লবী সংগঠনের কথা ফাঁস করেননি। তিনি করেছেন বিপ্লবী সংগঠনের হাত থেকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে। বিশেষ করে বিপ্লবী সংগঠনের প্রধান হোতা কমান্ডার মোয়াজ্জেমের সাজা হোক এটাই তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব এলেন কী করে! মহাভাবনার বিষয়! বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় বসে এসবই আকাশ-পাতাল ভেবে চলছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সরকার পক্ষের তিন নম্বর রাজসাক্ষী আমির হোসেন মিয়া।

চারিত্রিকভাবে তিনি খুবই অসৎ প্রকৃতির লোক এবং ঘোর মদ্যপ। কিন্তু এখন খুবই সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে চলেছেন গত ক' মাসের ঘটনা প্রবাহ। আচ্ছা, আসামীপক্ষের উকিল সালাম সাহেব কী করে জানলেন, আমি যে তিনটি বিয়ে করেছি। আদালতে কী করে এ প্রশ্ন করলেন তিনি? আমার সম্পর্কে সব খবর সংগ্রহ করেছেন। প্রথম বিয়ের কথা আমিইতো ভুলে গিয়েছিলাম। সোনাইমুড়িতে পাশের গ্রামের মেয়ে হাজেরা বিবির সাথে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। তখন মাত্র দু'বছর মেয়াদ শেষ করেছি চাকরির। ছুটিতে বাড়ি

গেলে বাবা এই বিয়ে দেন। মাত্র পনেরো দিনের ছুটি ছিল। কাকুলে ফিরে এসে পোষ্টিং হয় করাচি সেনানিবাসে। সেখানে এসেই কমান্ডার মোয়াজ্জেমের পাল্লায় পরা। করাচিতে তিনি প্রথমে হাবিলদার বাহ্‌রাম খা এর মেয়েকে বিয়ে করেন। হাবিবার গর্ভে একটি মেয়েও হয় তাদের। তিন বছর পর তার পোষ্টিং হয় ঢাকায়। হাবিবাকে তালাক দিয়ে চলে আসেন ঢাকায়। ঢাকায় তিন মাস একা থাকার পর বিয়ে করেন মোগলটুলির উম্মে জাহানারাকে। জাহানারা খুবই সুন্দরী এবং পরহেজগার মেয়ে। এ বাড়িটা জাহানারার বাবা দিয়েছেন আদরের মেয়েকে। সতেরো বছর চাকরির পর তিনি অবসর নেন। এখন তিনি বেকার। শুধু রেশনের চাল, গম, ডাল, ঘি, লবণসহ সকল জিনিস বাইরের বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাতে হয়। সংসারের খরচ অবশ্য খুবই কম। টাকাটা বেশি লাগে ভদকা কিনতে। ভদকার বোতল ঘরে না থাকলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। চাকরিতে যতদিন ছিলেন কোনো সমস্যা হয়নি টাকা-পয়সার। মাসে মাসে বেতন। তোশাখানার জুম্মনখার সঙ্গে ছিল বন্ধুত্ব। ভদকার টাকা আসতো জুম্মন খার কাছ থেকে। পরে যখন বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন তখন থেকে কোষাগারতো তার নিজের হাতে।

ভাবনার মোড় ঘুরে আবার ভাবতে বসলেন, শেখ মুজিব এই মামলায় এলো কীভাবে? মোয়াজ্জেমতো কোনো মিটিং এ শেখ মুজিবের কথা বলেনি। আমিতো জানি এবং আমরা সংগঠনের সকলেই জানি, কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এই বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছেন গোপনে। পাকিস্তানিদের হাত থেকে বাঙালি স্বার্থ রক্ষার জন্যে। কিন্তু শেখ মুজিবতো রাজনৈতিক নেতা। বাইরের লোক। সেনাসদস্যদের গোপন এই সংগঠনের সঙ্গে তার নাম এলো কী করে? ভেবে পান না। আবার মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করা হয়েছে। চাকরিতে বহাল থাকা অবস্থাতেই শেখ মুজিবের নাম শুনেছেন। রাজনীতি করেন, ছয় দফা দিয়েছেন। ছয় দফার সঙ্গে বিপ্লবীদের কী সম্পর্ক? বিপ্লবীরাতো সেনা সদস্য। তারা অস্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করে ফেলার গোপন ষড়যন্ত্র করছিল। এখানে আগরতলারই বা সম্পর্ক কী আর শেখ মুজিবেরই বা সম্পর্ক কী?

মামলার সাক্ষী চলছে। গতকাল মাত্র আমির হোসেন মিয়া ক্যান্টনমেন্টের ট্রাইবুনালে সাক্ষী দিয়ে এসেছেন। আগে থেকে শেখ মুজিবকে চেনানো হয়নি। তাই এই ভুল সনাক্ত। এখন তার কী হবে? যদি মামলায় সরকার পক্ষ জেতে তবে তার প্রাণটা বেঁচে যেতে পারে। তিনি মঞ্জুর কাদেরর হাত পা ধরে একটা কোনো করপোরেশনে চাকরি নিয়ে করাচি চলে যাবেন। থাকবেন না শালার এই দেশে! কিন্তু যদি সরকারপক্ষ হেরে যায়! যদি আসামিপক্ষ জিতে সব খালাস পেয়ে যায়! এবার তবে মোয়াজ্জেম নিজে হাতে খুন করবে আমাকে। বাঁচার উপায় কী?

আরো গরম লাগতে থাকে। রোদ যেন আরো তেতে উঠেছে। দুপুর গড়িয়ে যায় প্রায় তবু রোদের তেজ কমে না। দু'টো কাক সামনের দালানের কার্নিসে বসে খুনশুটি করছে। তিনি তাকিয়ে থাকেন সেদিকে কিন্তু মনের ভেতর চলতে থাকে গতকালের সাক্ষী দেওয়া মামলার প্রতি। কী হবে মামলার? কী হবে তার ভবিষ্যৎ? তার মনের সামনে এখন দু'টো জিনিসের উদয় হয়েছে। একদিকে ফাঁসির দড়ি আর এক দিকে কমান্ডার মোয়াজ্জেমের হাতে খোলা তলোয়ার। তাকে কী তলোয়ার দিয়ে মারা হবে? না গুলি করে হত্যা করা হবে? শিউরে উঠে সামনে চোখ পড়তে দেখেন কাক দু'টি উড়ে গেছে। গতকালের ট্রাইবুনালের দৃষ্টিটা আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সরকার পক্ষের উকিল মঞ্জুর কাদের যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রথমে একটু গলা কেঁপেছিল তারপর হরহর করে বলে গেছেন আমির। সাক্ষ্য গ্রহণের পর উকিলদের সারি থেকে উঠে কাঠগড়ার কাছে এগিয়ে আসেন একজন সাহেব মানুষ। মঞ্জুর কাদের আগেই বলে দিয়েছিলেন, তোমাকে আসামি পক্ষ থেকে জেরা করবে। বিলেত থেকে আসা শেখ মুজিবের পক্ষের আইনজীবী টমাস উইলিয়াম। তিনি কিন্তু বিলেতের খুব বড়ো উকিল। বৃটেনের রানির উকিল। বুঝেশুনে প্রশ্নের উত্তর দিও। যেটা না বুঝবে বিচারককে বলবে বুঝিয়ে দিতে। চট করে কোনো প্রশ্নের ওল্টা-পাল্টা উত্তর দিয়ে বসো না। শোন, তোমাদেরতো একটা কোড ম্যাসেজ ছিল সেটা কী বলোতো।

– ডি-ডে।

– আর যাদের ছদ্ম নাম ছিল, নামগুলো বলোতো।

– নাম ধরে ধরে বলবো?

– হ্যাঁ, সেভাবেই বলো। কার কী নাম ছিল। আমির হোসেন মিয়া ঝরঝর করে বলে গেল, ১ নম্বর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নাম ছিল– 'আলো'। তিনি এই মামলার ২ নম্বর আসামি। তারপর 'উল্কা'– আমার নাম। আমি তো এই মামলার ৩ নম্বর আসামি ছিলাম। এখন রাজসাক্ষী।

তারপর?

– 'তুহিন' এই ছদ্ম নামটি ছিল লে. মোজাম্মেল হোসেনের ১নং রাজসাক্ষী।

বলে যাও। থাম কেন?

– 'কমলা' প্রাক্তন এল/এস সুলতান উদ্দিন আহমেদ। ৫ ছিলেন 'মুরাদ' স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান। ৩ নম্বর আসামী। 'পরশ' শেখ মুজিবুর রহমান। 'তুষার' সিএসপি এস এ রহমান। 'সবুজ' নূর মোহাম্মদ ৫ নম্বর আসামি এবং সর্বশেষ 'শেখর'– জনাব রুহুল কুদ্দুস, তিনিও সিএসপি অফিসার। এই মামলার ১০ নম্বর আসামি।

– তোমার এবং শেখ মুজিবের ছদ্ম নামটি ঠিকঠাকভাবে বলতে হবে কোর্টে। তোমার সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে। পারবে না?

– পারবো স্যার।

এতো কিছু শিখে যাওয়ার পরও টমাস উইলিয়ামের প্রশ্নের জবাবে কেমন ভরকে গিয়েছিলেন। টমাস উইলিয়ামের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পাহাড়ের মতো ইয়া লম্বা শরীর। ছয় ফুটের নিচে হবে না। ট্রাইবুনালে উপস্থিত সবার চেয়ে লম্বা। তবে মনে হয় শেখ মুজিবও তার সমান সমান হবে। টমাস উইলিয়ামের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। যদিও ব্রিটিশ লোক। কিন্তু গায়ের রং আমেরিকান ফার্মে উৎপাদিত সাদা গমের মতো। তবে রং একটু গোলাপি। চেহারা ইংরেজ মুখোই। কথা বলে ব্রিটিশ ইংরেজিতে। সব প্রশ্ন ঠিকভাবে বুঝতেও কষ্ট হয়েছিল।

উইলিয়ামের প্রশ্ন না বুঝতে পারায় বার বার বিচারকের দিকে তাকাতে হয়েছিল। বিচারক মুকসুমুল হাকিম বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তাতে আবার ঐ লালমুখো বানর জিজ্ঞেস করে, জনাব মিয়া, আপনি কি করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে এম এ পাস করেছেন এবং সেখানে কি ইংরেজিতে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়েছিল?

হ্যাঁ।

সারাশি আক্রমণ উইলিয়ামের– তবে কেন আপনি আমার ইংরেজি বুঝছেন না?

– আপনার ইংরেজি ভিন্ন ধরনের এবং উচ্চারণ আমাদের থেকে পৃথক।

– আপনাকে কি ষড়যন্ত্রমূলক কাজের জন্য মার্কিন কনস্যুলেট-এর সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল?

– হ্যাঁ।

– আপনি আমার ইংরেজি বুঝেন না তবে মার্কিন ইংরেজি উচ্চারণ কি করে বুঝেছিলেন?

বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের প্রশ্নের প্যাচে অথৈ এ তলিয়ে যাচ্ছিলেন আমির হোসেন মিয়া।

আরেক আইনজীবী আবদুস সালাম আরো প্যাচানি। তিনি সরাসরি বিয়ের প্রশ্নে চলে যান– আপনার বিয়ের তারিখ বলুন।

– আমার বিয়ের?

– হ্যাঁ।

– ভুলে গেছি।

সারা ট্রাইবুনাল কক্ষে একটা হাসির রোল পরে যায়। বিচারকরাও হেসে ফেলেন।

সাথে সাথে আবার প্রশ্ন– আপনি ক'টা বিয়ে করেছেন?

– একটা।

– একী।

– ভেবে বলছেন?

– হ্যাঁ।

– ম্যাট্রিক পাস করার পর ১৯৪৮ অথবা ৪৯ সালে হাজেরা বিবির সাথে আপনার বিয়ে হয়েছিল কি?

তাজ্জব! একথা এরা জানলো কি করে? এটাতো তিনি নিজেও ভুলে গিয়েছিলেন। চুপ করে থাকলে চলবে না। প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। মুখ কাচুমাচু করে বলেন– ১৯৫০ অথবা ৫১ সালে আমির মোল্লার মেয়ে হাজেরার সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল। পরে ১৯৬০ অথবা ৬১ সালে আমি তাকে তালাক দেই।

– সামাদ মোল্লা ও হামিদ মোল্লা কে?

– এরা হচ্ছেন হাজেরা বিবির ভাই।

– জেরার এক পর্যায়ে আপনি আদালতে বলেছেন যে, ১৯৬৭ সালে আপনি প্রথম বিয়ে করেছেন। এই উক্তি দ্বারা আপনি কি আদালতে মিথ্যা কথা বলেননি?

– আগের বিয়ে আমার পিতা ঠিক করেছিলেন এবং পরের বিয়ে আমি নিজে করেছি। সেজন্যই আমি বলেছি যে, ১৯৬৭ সালে প্রথম বিয়ে করেছি। কাজেই এ কথা বলে আমি আদালতে মিথ্যে বলিনি।

– প্রথম স্ত্রীকে কেন তালাক দিয়েছিলেন?

– আমি তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে রাজি হয়নি। আমি কয়েকবার চেষ্টা করি। ১৯৫৬ সাল থেকে তালাক দেওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার মনোমালিন্য চলতে থাকে।

– ঐ সময়ে আপনার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন কি?

– আমি বলতে পারব না।

– ১৯৫৮ সালে আপনি স্ত্রীকে লেখা পত্রে 'প্রিয়তমা' বলে সম্বোধন করেছিলেন কি?

বিচারক এস, এ রহমান কৌসুলিকে জিজ্ঞেস করেন–

– এমন প্রশ্নের সঙ্গে মামলার কি সম্পর্ক?

– মি লর্ড, সাক্ষী সত্য বলার শপথ নিয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলছে। এই সাক্ষী মিথ্যেবাদী সাক্ষী এবং সরকারের তৈরি সাক্ষী।

বিচারক 'প্রসিড' বলার পর আবার প্রশ্ন স্ত্রীকে আপনি লিখেছেন কি না যে, 'তোমাকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখি এবং স্বপ্নে কথাবার্তা বলি।'

– না, তার সঙ্গে আমার মনোমালিন্য ছিল।

এই সময় আবদুস সালাম সাক্ষীর হাতের লেখা একটি চিঠি হাতে দিয়ে বলেন– দেখুনতো, এই কথাগুলো আপনি লিখেছিলেন কি না।

চিঠির ঐ অংশটুকু পড়ে আমির হোসেন মিয়া বলেন,

– আমি লিখেছিলাম যে, রাতে আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখি।

আবদুস সালামের ঠোঁটে চিকন হাসি খেলে যায়।

কাঠগড়ার সামনে একটা চক্কর দিয়ে ঘুরে এসে আবার প্রশ্ন করেন– করাচি থাকা অবস্থায় আপনি উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করেন। এবং তার গর্ভে রাবেয়া নামে আপনার একটি মেয়ে আছে? আমির হোসেন মিয়ার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এসব গোপন কথা এরা জানলো কি করে? তাহলেতো দেখা যায় আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা বিবাদি পক্ষের উকিলের কাছে ধারাপাতের নামতার মতো মুখস্থ! কোনো কথা আর গোপন করা যাবে না।

কোনো ভাবনার সুযোগ না দিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন– বর্তমান স্ত্রী আপনার তৃতীয় বিয়ের?

– জ্বী।

– আপনার বর্তমান স্ত্রীর নাম বলুন

– জাহানারা

আবদুস সালাম মুখ কঠিন করে বলেন– আপনি কি জানেন, যদি কেউ মিথ্যা সাক্ষী দেয় তবে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়?

– জানি।

– এ কথা জেনেও আপনার প্রথম এবং দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে আমি আদালতে আর্জি পেশ করব।

বিচারপতি এস. এ. রহমান বললেন, এটা কোনো প্রশ্ন হলো না। মাননীয় কৌসুলির উচিত পরবর্তী প্রশ্ন করা।

– মি লর্ড! আমি তাকেই প্রশ্ন করছি, যে ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বলছে।

– ঠিক আছে, পরবর্তী প্রশ্নে যান।

– ডি-ডে-এর অর্থ কি?

– ডে অব এ্যাকশন।

– কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হলে আপনি কি খুশি হবেন?

– তখন যদি হতো খুশি হতাম।

– এখন কি অখুশি আপনি?

– আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদি আন্দোলন সাফল্য লাভ করেনি বলে আমি এখন মোটেও অখুশি নই। প্রকৃতপক্ষে আমি আনন্দিত যে, পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যায়নি।

– আপনি নীতিগত প্রশ্নে দলত্যাগ করেছিলেন?

– না, হিসেবের ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেওয়ায় দলত্যাগ করি। তবে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হোক এটা আমি চাইনি।

আসামি পক্ষের আইনজীবীদের বসার স্থান থেকে উঠে এগিয়ে এলেন টমাস উইলিয়াম এবং আবদুস সালাম খান সাহেব গিয়ে বসলেন এডভোকেট সারিতে। আচানক একেবারে অন্য ধরনের প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন টমাস উইলিয়াম– আপনি ১৯৬৪ সালের ৪ঠা মে পর্যন্ত সকল চিঠিপত্র জমিয়ে রেখেছিলেন এটা কি সত্য?

– হ্যাঁ।

– কেন রেখেছিলেন?

– আমার আত্মজীবনী লিখব বলে জমিয়ে রেখেছিলাম।

– এই চিঠিগুলোর কি গুরুত্ব ছিল?

– আমার কার্যকলাপের একটা প্রত্যক্ষ চিত্র তুলে ধরার জন্য এগুলো রেখেছিলাম।

– আপনি কি জানতেন, এই চিঠিগুলো অত্যন্ত বিপদজনক?

– জানতাম।

– পুলিশের হেফাজতে থাকাকালে এই পত্রগুলো তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই আপনি এগুলো জমিয়ে রেখেছিলেন?

– না।

– আপনি মিথ্যা কথা বলছেন যে, আপনার কাছে পত্রগুলো ছিল তা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন।

– না।

– আপনি কেন এগুলো এবং বিপ্লবী সংগঠনের দুটি ডায়েরি নিজের কাছে রেখেছিলেন?

– আমি বলতে পারব না।

– মি. মিয়া, আত্মজীবনী লেখার জন্য রেখেছিলেন কি?

– না, সেজন্যে নয়।

– শেখ মুজিব আপনাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের কয়টি সভায় উপস্থিত ছিলেন?

– বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত দুইটি সভায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আমি উপস্থিত ছিলাম।

– আপনি শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি চেনেন?

– চিনি।

– দ্বিতীয় বৈঠকটি কোথায় বসেছিল?

– ধানমন্ডি এলাকায় জনাব তাজুদ্দিনের বাড়িতে।

– এই বৈঠক ছাড়া কতবার শেখ মুজিবের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল?

– অনেকবার। কিন্তু কতবার তা আমার মনে নেই।

– শেখ মুজিব আপনার সাক্ষাতে কতবার টাকা দিয়েছিলেন?

– একবার আমার উপস্থিতিতে শেখ মুজিব স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে টাকা দিয়েছিলেন।

– কত টাকা?

– চার হাজার টাকা।

– ঢাকা হোটেলের বিল শোধের জন্য?

– না। ঐ সভায় লে. মোয়াজ্জেম হোসেন আন্দোলনের জন্য টাকার দরকার বলে জানান। শেখ মুজিবুর রহমান এক লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে সম্মত হন। তিনি এক একবার দুই হতে চার হাজার টাকা করে দেবেন বলে জানান।

আর তক্ষুনি টমাস উইলিয়াম পাশে এসে প্রশ্ন করেন, ঐ যে কাঠগড়ায় ৩৫ জন আসামি দাঁড়িয়ে আছেন। শেখ মুজিবুর রহমান কোন ব্যক্তি আপনি আঙুল উঁচিয়ে শনাক্ত করুন তাঁকে।

পরে গেলেন বিপদে। চোখ ঘুড়িয়ে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু কে শেখ মুজিব? তিনিতো কখনো দেখেননি। আমির হোসেন মিয়াকে নীরবে ভাবতে দেখে উইলিয়াম ধমকের কণ্ঠে বলেন– বলুন, শেখ মুজিব কোন জন?

আমির হোসেন মোটা গোফওয়ালা লম্বা দেহের লোকটিকে দেখিয়ে বলেন, ইনি শেখ মুজিব।

পুরো ট্রাইবুনাল কক্ষে একটা উচ্চ হাসির রোল ছড়িয়ে গেল।

তখন উইলিয়াম মোটা গোফওয়ালা আসামিকে বললেন,

– আপনার নাম বলুন।

– আমি সার্জেন্ট জহিরুল হক।

আবার হাসির ঢেউ।

তারপর মুখ ঘুড়িয়ে টমাস উইলিয়াম বললেন,

– মি. মিয়া, আপনি এতক্ষণ সাক্ষীতে যা বলে গেলেন সব কথা মিথ্যা, বানোয়াট এবং তৈরি করে দেওয়া কথা বললেন।

– সত্য নয়।

আবদুস সালাম খান প্রশ্ন করলেন,

– মি. মিয়া, পানের অভ্যাস আছে আপনার?

না, আমার স্ত্রীর আছে। ভাত খাওয়ার পর মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে নিয়ে একটা খাই।

আবদুস সালাম মৃদু হেসে বললেন– আমি তাম্বূলের অভ্যাসের কথা বলছি না। সুরা পানের অভ্যাস আছে কি না তাই জিজ্ঞেস করেছি।

– না।

আবদুস সালাম ফাইল থেকে কিছু রিসিট বের করে আমির হোসেন মিয়ার হাতে দিয়ে বললেন, দেখুন তো, বিভিন্ন সময়ে আপনি যে সুরা কিনেছেন সেগুলির পে-স্লিপ কিনা এগুলো।

একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে উত্তর দিলেন– হ্যাঁ।

– এই রশিদগুলোই প্রমাণ করে আপনি চূড়ান্ত মদ্যপ একজন মানুষ।

কোনো উত্তর করেন না আমির হোসেন মিয়া।

দুজন জাদরেল আইনজীবীর উপর্যুপরি প্রশ্নের ঝড়ে উড়ে যাওয়ার দশা আমির হোসেন মিয়ার।

উইলিয়াম বিচারকদের উদ্দেশ্যে বললেন– মি. লর্ড, এই সাক্ষীকে আমাদের আর কোনো জিজ্ঞেস্য নেই। আমরা বোধ হয় এতক্ষণে মাননীয় বিচারকগণের সামনে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে, এই সাক্ষী মিথ্যাবাদী এবং তার সব কথা তৈরি করে দেওয়া।

এতক্ষণে মঞ্জুর কাদের তাকে নেমে আসতে বললেন সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে। মঞ্জুর কাদেরের জবানিতে বেশ অসন্তুষ্টি ছিল।

ব্যথায় পিঠের শিরদারা টনটন করছে।

খেয়াল করে দেখেন কেমন ক্লান্ত লাগছে। ঘড়ি দেখলেন, পাক্কা দু'ঘণ্টার ওপর এই বারান্দায় বসে আছেন। ভাবছেন। ভাবনার অথৈ জগতে ডুব-সাঁতারের খেলা চলতে থাকে আমির হোসেন মিয়ার বুকের ভেতরে।

বাইরের রোদের তেজ কমে এসেছে। পড়ন্ত বিকেল। তারপরও গ্রীষ্মের মজা বিকেলের রোদটা তারে শুকিয়ে যাওয়া শাড়ির মতো ঝুলতে থাকে।

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

দেশের ছবি

গোলাম নবী পান্না

দেশকে নিয়ে ভালোবাসায় মায়ার ছবি ভাসে,
স্নিগ্ধ-শীতল পরশ তারই ফিরে ফিরে আসে।
তার সে ছায়া আগলে রাখে সারা জীবনভর
আমরা তাকে ভুলে গেলেও সে করে না পর।
দেশকে নিয়ে ভাবার আছে অনেক কিছু তাই
এই দেশেরই কাছে সবার ঋণের সীমা নাই।
দেশের হাওয়ায় বেড়ে ওঠায় কম কী সে হয় চাওয়া?
দেশের কাছে যেন সবার সকল চাওয়া-পাওয়া।
দেশকে ছেড়ে প্রবাস জীবন–পাড়ি জমায় যারা
দেশের প্রতি প্রবল মায়া বুঝতে পারে তারা।
যতই দূরে থাকেন তবু দেশের মায়া টানে–
সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠেন দেশের ছায়া-গানে।
তাই বলি এই দেশকে সবাই প্রিয় বলে জানুন
ভালোবেসে দেশের ছবি স্মৃতির রেখায় টানুন।

বাজাসন বিহার

মিয়াজান কবীর

হীরা নদীর কূলে সুয়াপুর নান্নার সন্ধিস্থলে–
গড়ে উঠেছিল বিদ্যাপীঠ 'বাজাসন বিহার'
অষ্টম শতকের ইতিহাস সে কথাই তো বলে
প্রাকৃত হরফে হয়েছিল শিক্ষা বিস্তার।
এখানে দীক্ষা নিয়েছিলেন অতীশ দীপঙ্কর
বজ্রযোগিনীর কল্যাণশ্রীর বারো বছরের ছেলে,
বৌদ্ধভিক্ষুরা রেখেছিলেন শিক্ষার স্বাক্ষর
মৌর্য আমলে বাজাসনে শিক্ষার আলো জ্বেলে।
কালের প্রবাহে সভ্যতা আজ ভগ্নস্তূপ,
ইতিহাস কথা দাও– থেকো না আর নিশ্চুপ।

অমর কবিতা

বাতেন বাহার

এই দেশ এ মাটির ফুল ফল যত তরুলতা
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ হেসে নেচে বলে যার কথা...
বলে যার ইতিহাস সুখ দুখ জয়গান আর
ভাষা প্রেম, স্বাধীনতা কি করে যে এল মাটি মার!
এ দেশের গিরি নদী জলাশয়- পাখ্ পাখি ঠোঁটে...
ঝরনার দুই পাড়ে কাশ ফুল ঘাস ফুল ফুটে
হেসে হেসে যার কথা নিশি দিন প্রাণ খুলে বলে
তিনি মার সেরা খোকা, মা-মাটির জয় যার গলে।
'জয় জয়- বাংলার জয়' যিনি এঁকে প্রাণ পণে
মার্চের উত্তাল দিন ক্ষণে জনতার মনে
রেখে সেরা মতামত এঁকে প্রিয় স্বাধীনতা মার
ন'মাসেই দিয়েছেন মার গলে বিজয়ের হার।
তিনি মার সেরা খোকা, যার লেখা- কবিতা-অমর
চিরদিন মোছবেই বাঙালি মন থেকে ডর।

সেরা উৎসব

শরীফা আক্তার বাঁশরী

বাজে ঢোল বাজে ঢাক
ডাকে ঘুঘু ডাকে কাক,
বাঙালি জীবনের সেরা দিন ক্ষণ
অতীতের স্মৃতি কথা নাচায় এ মন।
কোলাহল কলবর
সব সেরা উৎসব,
উৎসবে প্রতিভাত বাঙালিয়ানা
মিষ্টির স্বাদ নিতে নেই কারো মানা।
মানা নেই জানা নেই
তাই খুশি অনেকেই,
দিন শেষে আসে কি-না বৈশাখি ঝড়
ফুর্তিতে কারো প্রাণে নেই ভয় ডর।

প্রজন্ম চত্বর

আতিক আজিজ

হাওয়ার ভিতর
বালুর মতো মিশে থাকার কৌশল রপ্ত করছি
না হলে টিকে থাকা মুশকিল
এই যে একরতি আলোর ভয়ে প্রচ্ছন্ন হই
বিলুপ্ত প্রজাপতির দলে ঢুকে সাজাই প্রজন্ম চত্বর
কখনোবা পাহাড়ের শরীর থেকে আলাদা হয়ে
ঝড়ের মুখোমুখি হই
ঝড়ের পরেও কিছু মেঘ
বৃষ্টি হতে পারে না বলেই এত ঘর্ষণ ও বজ্রপাত
ঝড়ের পরেও
কিছু বালুকণা
একে অপরের সাথে জুড়ে
পাহাড় হয়ে উঠতে পারে...
সাবধান!

ভিজবে নাকি প্রকৃতি

শাহনাজ

আকাশ ভিজে না
ভিজেছে নাকি প্রকৃতি
দেহের আচ্ছাদন
কুয়াশায় মোড়ানো
পড়ে গেছে কেউ রাত্রে
তবু আসমানে উড়ে যেতে যায় মন
ভিজেই বছর গেল,নতুন বছর
জানুয়ারি পার হলো
আসছে বৈশাখ, নতুন বছর বাংলা
দাপাদাপি বৃষ্টি ঝড়
ভিজবে নাকি প্রকৃতি!

আমি এক বৈশাখি ঝড়

মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ

আমি এক বৈশাখি ঝড়
দিগন্ত হতে দিগন্তে ছুটে যাই
মেঘের উপর করে ভর।
আমি পাষান ভেঙে করি সব চুরমার
রণতোর্যে গর্জে উঠি
বজ্রকণ্ঠে মারি হুংকার,
আমি এক প্রলয় নাট্য উৎসব
আমার ঠিকানা বঙ্গোপসাগর।
আমি ভাঙনের গান
প্রচণ্ড শব্দ বুকের ভেতর
ছলাৎ ছলাৎ ভেঙে পড়ে যাই
আমি নৃত্য পাষান বক্ষ।
আমি বিক্রম: মৃত্যুর সাথে লড়ি হরদম
জয়ের নেশায় সদামত্ত।
আমি উদাসীন ভাবলেশহীন
নৃত্য পাগল ছন্দে
দিক হতে দিগন্তে ছুটে চলি
আবেগ প্রবণ চিত্তে
প্রবল উচ্ছ্বাসে ভরে তুলি
আনন্দ ঘন মর্ত্য
আমি রুদ্রতপ্ত বহ্নিশিখা
চিতা দুগ্ধ মৃত্যু তাপ
পুড়ে পুড়ে অঙ্গার
পাষান বক্ষে সীমারের দাগ।
আমি তৃষ্ণার জল
বুক ফেটে চৌ-চিড়
হাজার সুধা আমার ভেতর
নেশায় ঘোরে মশগুল।
আমি শঙ্কা, নেই ভয়-ভীতি সঞ্চার
মরুতপ্ত লেলিখান শিখা
বজ্র পানে করি ঢঙ্কা
আমি উন্মাদ উত্তাল তরঙ্গ ঘাত
এলোকেশী পাগলা পরাণ
মাতম নৃত্যে নাচি হরদম
আমি ঈশান কোণে বিজলীর চমক।
আমি বেওয়ারিশ লাশ
হাজার ঝাঁপটা বুকের ওপর
আমি স্থবির ভূমিপাত।
আমি নীল আকাশে মেঘদূত
বিশ্ব নিয়ে করি তোলপার
আমি কিংশুক শোকে মুহ্যমান
ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাস
প্রাণে প্রাণে করি আঘাত;
আমি অবিনাশী বিচিত্র বৈশাখ।

তুমি তো করোনা নও

সাদিয়া রেজা

তুমি তো করোনা নও
দৃশ্যমান! প্রেমে ভরা
তোমার চাহনি;
আটকে দিল সময়
দম বন্ধ হয়ে যায় কেন
আটকে যায় শ্বাসপ্রশ্বাস
নিঃশব্দে আমার মৃত্যু হচ্ছে!...

আলো ঘেরা আসমান রাত্রে

অমিত নূরী

এই আঁধারে আঁধার নিয়ে গেছে আলো
ঝলমলে রাতে তারার শূন্যতা,
নীচ থেকে চোখ তুলে আকাশ দেখা যায় না
আসমানে ভাসে ঘোলাটে আলোর অপচ্ছায়া–
ভারী পাওয়ারের চশমা-পরা রাত্রির আকাশ!
নজর দিলে ওপরে, মাথা ধরে যায়...
তারার ছড়ায় ভিজে ছিল অতীত জীবন শুনি
সন্ধ্যা তারা নীল, নাকি কালোর স্বজন!
আদম সুরাত নিয়ে কত কেচ্ছা
জলজ্যান্ত রাত্রির আকাশ
উধাও উধাও চোখে
আঁধার বুনটে চকমকি উজ্জ্বল ফোয়ারা স্থির,
ঢাকাই মসলিনের জমি–
ঊর্ধ্বে তাকালে ঢের পাওয়া যেত।
এশিয়ার গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের হানা
বাঁচার নোটিশে– আজ বিদ্যুতের আয়োজন
রাত্রির আকাশ কেউ মনে রাখে আর?
বিদ্যুতচ্ছটায় ঘিরে ধরা
আসমান রাত্রে...।

বোশেখ আসে

মো. জাবিদ হোসেন

বোশাখ আসে নব রূপে
ভালোবাসার রং ছড়িয়ে
গাছে গাছে সবুজ পাতায়
বনে বনে পাখির বাসায়।
বোশাখ আসে আম কুড়াতে
ঝড়-বাদলের দিনগুলোতে
হালখাতার পাতায় পাতায়
উৎসবে ভাসে সারাদেশ ময়।
বৈশাখ আসে পান্তা ভাতে
ইলিশ ভাজার সুবাস নিয়ে
মুড়ি-মুড়কির মিষ্টি গন্ধে
গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে।

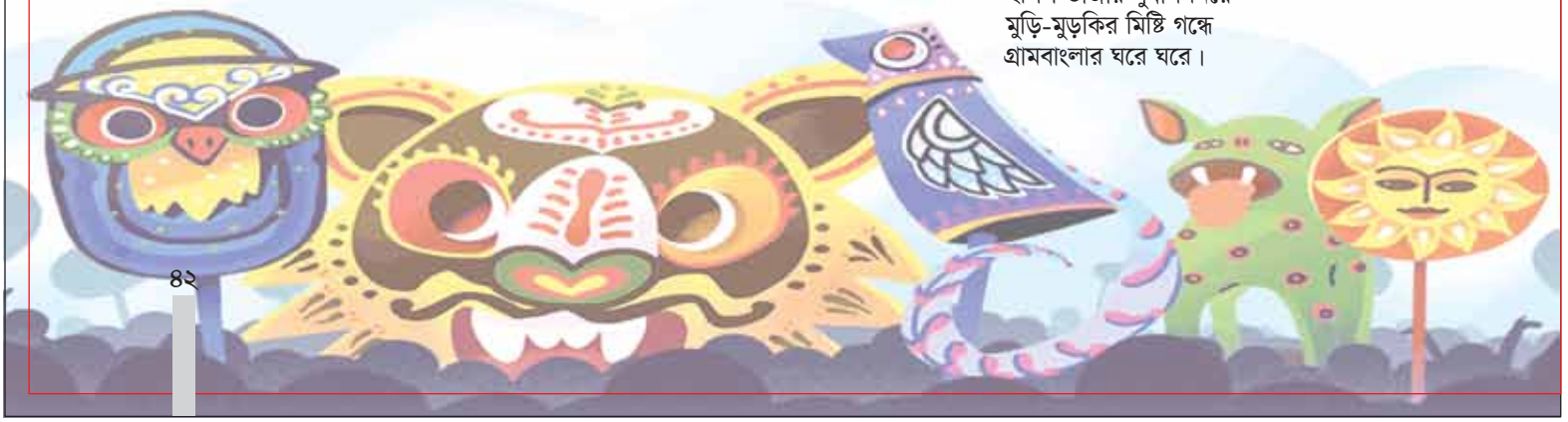

করোনা, হবো না লাশ

সানিয়াত রহমান

করোনা দেখিনি হবো না নিথর লাশ
দেখেছি চিকিৎসক দল
দূরে নিথর দেহের আভাস
সর্বত্র আচ্ছাদনের ভার, বোঝা যায়
পুরো শরীর, দেহ, লোকটা নেই
আছে হয়তো একটি
নিথর দেহের পিণ্ড
পৃথিবী এভাবে থেমে থাকবে না
জীবন অনেক বড়ো
বড়ো প্রতিরোধ–
সংহত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি
চারদিকে রণ দুন্দুভি বাজছে
সতর্কতা তার চলছে পালটাঘাত...
মানুষের ভাই
মানুষের বোন
হাঁটে দুলিয়ে দুলিয়ে দেহ
জীবনের ডাক শুনি...।

হিজড়া

রুস্তম আলী

ওদের
দেহ- মন-প্রাণ আছে
আছে হৃদয়খানি।
কী যেন নাই
হীরার চেয়েও দামি
তা জানে অন্তর্যামী।
ওরা যেন–
আমাজান থেকে আসা
কারো মায়া-মমতা নাই
নাই কারো ভালোবাসা।
ওদের–
চাকরি-বাকুরি কাজ নাই।
ভাইবোন বন্ধু নাই
নাই নাই কিচ্ছু নাই
মাথা গুঁজার ঠাঁই নাই।
ঘর বাঁধার স্বপ্ন নাই
নাই নাই কিচ্ছু নাই।
ওদের আছে শুধু–
আকতি-মিনতিটুকু
মসজিদে জায়গা না পাই
মন্দিরে জোটে না ঠাঁই
চিতায় পুড়ে না দেহ
কবরে রাখে না কেহ।

করোনা ভাইরাস তোমাকে অভিশাপ, চিরনির্বাসনে যাও

নির্মল চক্রবর্তী

নেই কোথাও কেউ নেই
নিস্তরঙ্গ জীবন এখানে
যেন নিঃশব্দতার পাহাড় এক
থমকে গেছে কোলাহল পৃথিবীর জাগ্রত মানুষের স্বপ্ন গেছে ভেঙে–
কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো
জনসমক্ষে মৃত্যু পরোয়ানা হাতে নিয়ে বললেন,
তোমাদের জন্য আমি
আমি যে তোমাদেরই লোক
চলে যাওয়া ঘরে-নিশ্চিত করে বলছি
তোমাদের সমস্যাকে পাহাড় হতে দেব না,
দেব না আর গলিত লাশ হতে নির্ভয় থাকো কয়েকদিন
আলোকোজ্জ্বল সময় আসবে
তার ভাষণে সংশয় কেটে গেছে
তবু সংকট ভীতির কঠিন ছায়া স্তব্ধ করে দিয়েছে
সত্তর দেশের জনজীবন
মৃত্যুভয় দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরার ভয়
গোপন তারিখের মতো মানুষ বয়ে চলেছে
সেই পথে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে
দশ হাজার ঠিকানাবিহীন নিষ্পাপ মানুষ
করোনা ভাইরাস তুমি দ্রুত গতিতে চলে যাও
নিকষ অন্ধকারে আর কত লাশ চাই তোমার
কে দেবে তোমাকে অত লাশ?
মহামারির মতো ধেয়ে এসো না তুমি
নির্মূল হও পৃথিবী থেকে
তার বুক থেকে শান্তি শান্তি বলে চিৎকালে মানুষ
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চোখে কান্না
ওরা এখন কোথায় যাবে?
যেখানে করোনা তোমার ছায়া লেশ মাত্র নেই।

নববর্ষের শুভবার্তা

আপন চৌধুরী

নতুন বছরের শুরু, পুরাতন বছরের শেষ
থাকবে না আর মনে জরাজীর্ণতার ক্লেশ।
কিছু সুখ, কিছু বেদনা আর কিছু আশা
এই নিয়ে চলছে সব ভালোবাসা।
ছোটো ছোটো কলি হয়ে যায় বড়ো বড়ো ফুল
মনের কয়েকটি কথা থেকে যায় ভুল।
করোনা তুমি আমার প্রতি কোনো অনাচার
নববর্ষে তোমার জন্য দিলাম ছোট্ট উপহার।
নিজের জন্য তুমি সাজিয়ে রাখ কতেক পরসা
শুভদিন তোমার জন্য নিয়ে আসুক নব বরষা।
তোমার কাজল কালো দুটি আঁখি
দিবে কি আমায় শুধুই ফাঁকি?
আমি কবি হলে তুমি আমার কবিতা
মনে আমার জাগে শুধু তোমারি ছবিটা।
ও আমার সোনার বাংলার মাটি
তুমি সোনার চেয়েও খাঁটি।
নববর্ষে এই আমার আশা
পাই যেন সবার ভালোবাসা।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে ১২ই মার্চ ২০২০ বঙ্গভবনে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা হস্তান্তর করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্ববাসীর প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল বাঙালি জাতির নয়, বিশ্ববাসীর জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, '৭ই মার্চ, বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একটি দিন। এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর অনন্য সাধারণ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে অর্জন করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।'

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম এ কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তিকামী জনগণকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ঐ ভাষণ ছিল এক মহামন্ত্র। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা 'ইউনেস্কো' ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর এ ভাষণকে 'ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ'র মর্যাদা দিয়ে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের বড়ো অর্জন। এ ভাষণের কারণে বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' হিসেবে অভিহিত করে। তাই বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয়, বিশ্ববাসীর জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে শুরু করে সকল কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার নারী-পুরুষের সমতা বিধানে নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়নসহ নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া দেশের টেকসই উন্নয়নে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সহযাত্রী হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। ৮ই মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২০' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের ফলে নারী উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, কূটনীতি, সশস্ত্রবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, শান্তিরক্ষা মিশনসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর সফল অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে সমঅধিকারের একটি বাসযোগ্য পৃথিবী, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এটাই হোক সকলের প্রত্যাশা।

মুজিববর্ষের কর্মসূচি বঙ্গবন্ধুকে জানতে সাহায্য করবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, মুজিববর্ষের কর্মসূচি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে। ১২ই মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির একটি প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন। মুজিববর্ষ উপলক্ষে কমিটির গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা হয়। এ সময় রাষ্ট্রপতি বলেন, তরুণ প্রজন্ম ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর দিন ১৭ই মার্চ বাঙালি জাতির জন্য শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন নয়, এটি আনন্দেরও দিন।

ভোক্তার অধিকার সুরক্ষায় আইনের যথাযথ প্রয়োগের আহ্বান

ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষায় বিদ্যমান আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ

করতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ১৫ই মার্চ 'বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও সেবা প্রদানে যে-কোনো অনিয়ম মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুণগতমান নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। তাই খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ প্রতিরোধে বিশেষ নজরদারি প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি আরো উল্লেখ করেন, ভোক্তা অধিকার সর্বজনীন। পণ্যের ন্যায্যমূল্য ও গুণগত মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' প্রণয়ন করেছে। তাই আইন প্রণয়নের পাশাপাশি এর যথাযথ প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। এ বছর এ দিবসটির প্রতিপাদ্য– 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার-সুরক্ষিত ভোক্তা অধিকার'।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

উন্নয়ন প্রকল্পে কোনো দুর্নীতি-অনিয়ম না করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে ফেব্রুয়ারি তাঁর কার্যালয়ের শাপলা মিলনায়তনে ঢাকার নবনির্বাচিত দুই মেয়র ও কাউন্সিলরদের শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মেয়র ও কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বলেন, জনগণের কাছে আপনারা ওয়াদাবদ্ধ। এলাকাবাসীর সবার জন্য সমানভাবে কাজ করতে হবে। কারণ আপনি সবার। তিনি জনপ্রতিনিধিদের কঠোর হুঁশিয়ারি দেন এবং দেশের উন্নয়ন প্রকল্পে কোনো দুর্নীতি-অনিয়ম না করার আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে যদি কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা কোনো রকম নয়-ছয় করে তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যাশা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-এর ফাইনাল ম্যাচ পরবর্তী পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আমাদের শিশু-কিশোররা অত্যন্ত মেধাবী। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক, দুর্নীতি থেকে আমাদের শিশু-কিশোরদের দূরে রেখে ধীরে ধীরে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সব ধরনের প্রতিযোগিতার উপর্যুক্ত নাগরিক হিসেবে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা গড়ে উঠবে। সেভাবেই আমরা তাদের গড়ে তুলতে চাই।

বীমার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ানোর আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে '১ম জাতীয় বীমা দিবস ২০২০'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বীমার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের তাগিদ দেন। তিনি বলেন, এখন গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত মানুষ অনেক বেশি সচেতন। বীমাটাকে তাদের কাছে নিয়ে যেতে সম্ভব হবে। তাহলে মানুষের আরো আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব হবে। বীমা করলে মানুষ যে সুবিধাগুলো পাবে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বীমা সংস্থাগুলোকে দুর্নীতিমুক্ত ও এর পরিসেবা আরো উন্নত করতে বীমা কোম্পানিগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। বীমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামটা যাতে সঠিকভাবে দেয় সেটাও যেমন প্রয়োজন, বীমার টাকা যেন সঠিকভাবে পায় সেটা নিশ্চিত করাটাও জরুরি বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া বীমা খাতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ৫ জনের মধ্যে বীমা পদক বিতরণ করেন এবং বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা মার্চ ২০২০ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে '১ম জাতীয় বীমা দিবস'-এর উদ্‌বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন–পিআইডি

ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অথরিটির (আইডিআরএ) বীমা ম্যানুয়েল এবং বীমা নির্দেশিকা নামক দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী।

মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে ৫ নির্দেশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা মার্চ খামারবাড়ি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০ উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে এগিয়ে নিতে পাঁচ দফা নির্দেশনা দেন। তিনি চাকরির পেছনে না ছুটে ব্যবসা করার আহ্বান জানান। কারণ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সরকারের বিনা জামানতে ব্যাংক ঋণ কর্মসূচির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে বিনা জামানতে সরকার নবীণ উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদান করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন থেকেও ঋণ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। স্ত্রীর নামে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুললে স্বামীরা বিশেষ সুবিধা পাবেন উল্লেখ করে সে সুযোগ গ্রহণে ব্যবসায়ী মহলের প্রতি আহ্বান জানান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি ফসলি জমি রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি পণ্য উৎপাদন, বাজারজাত, নতুন বাজার সৃষ্টিসহ এসএমই সংশ্লিষ্ট শিল্পের সব ক্ষেত্রে গবেষণার তাগিদ দেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ৫ জন শিল্পোদ্যোক্তার মাঝে এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২০ প্রদান করেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

ডিএফপি'তে ৭ই মার্চ পালিত

ঢাকায় সার্কিট হাউজ রোডের তথ্য ভবন মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই মার্চ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, আজ সেই ৭ই মার্চ, যেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির রক্তে আগুন ধরিয়েছিল, নিরস্ত্র বাঙালি জাতি সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। ৭ই মার্চ কোনো দলের নয়, এটি সমগ্র জাতির উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ করে জাতিসংঘের ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে প্রথিবীর ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে, স্বীকৃতি দিয়েছে। ৭ই মার্চ পালন না করা প্রকারান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামকেই অস্বীকার করার শামিল।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তথ্যসচিব কামরুন নাহার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী যখন সমাগত, আজ ৭ই মার্চের এই দিনে দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলাই হোক আমাদের শপথ। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)'র ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও ডিএফপি'র সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণে দুঃসাহসী ভূমিকা পালনকারী ৮ জনের দলের দুই জীবিত সদস্য আমজাদ আলী খন্দকার ও সৈয়দ মইনুল আহসান এ সময় স্মৃতিচারণ করেন। তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ তাদের দুজন ও অপর ছয় প্রয়াত সদস্য আবুল খায়ের মোঃ মহিব্বুর রহমান, জি জেড এম এ মতিন, এম এ রউফ, এস এম তৌহিদ, মোঃ হাবিব চোকদার ও মোঃ জোনায়েদ আলীর পরিবারের হাতে ৭ই মার্চ সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

সম্প্রচারকর্মী ও সম্প্রচার মাধ্যমের সুরক্ষাতেও ব্রতী সরকার

সম্প্রচার আইন ও গণমাধ্যমকর্মী আইনের মাধ্যমে দেশের সম্প্রচার মাধ্যম কর্মীরা চাকরিগত সুরক্ষার আওতায় আসবেন এবং সম্প্রচার মাধ্যমের সুরক্ষার জন্যও সরকারের নূতন পদক্ষেপগুলো সুফল বয়ে আনছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি)'র ২য় সম্মেলনের সূচনাপর্বে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার আয়োজিত 'সম্প্রচার সম্মেলন-২০২০' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

তথ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রচার মাধ্যমের পেশার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, অবশ্যই তাদের চাকরির সুরক্ষা প্রয়োজন। আমরা চেষ্টা করব খুব শিগগিরই গণমাধ্যমকর্মী আইন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য। আগামী সংসদ অধিবেশনে সেটি নিয়ে

যাওয়ার চেষ্টা করব। গণমাধ্যমকর্মী আইন যখন চূড়ান্ত হবে তখন গণমাধ্যমকর্মীদের চাকরির আইনগতভাবে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে তিনি সাংবাদিকদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

সম্প্রচার আইন নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রচার আইন দেড় বছর আগে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। সম্প্রতি আইন মন্ত্রণালয় এটির ভেটিংয়ের কাজ শুরু করেছে। আমরা আশা করছি দ্রুত ভেটিং হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আপনারা জানেন সম্প্রচার নীতিমালা রয়েছে, এটি আইনে পরিণত হবে।

একইসঙ্গে গণমাধ্যমের মালিকপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যমকর্মীদের চাকরির সুরক্ষার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের মালিকপক্ষকে অনেক বেশি তৎপর হতে হবে। ১০ বছর ধরে চাকরি করছেন, হঠাৎ সে জানলো তার চাকরি নেই। এটি গণতন্ত্রের পরিপন্থি, মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি। এটি কোনওভাবে কাম্য নয়। আমি আশাকরি আইন দুটো পাস হলে এমনটি আর হবে না।

সবার আগে সংবাদ দিতে গিয়ে যেন তথ্যবিভ্রাট না ঘটে

সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ দিতে গিয়ে যাতে ভুল তথ্য পরিবেশিত না হয়, সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ৪ঠা মার্চ রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে প্রয়াত বরেণ্য সাংবাদিক শাহ আলমগীরের স্মরণে 'স্বপ্নের সারথি শাহ আলমগীর' গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় গণমাধ্যম প্রসঙ্গে একথা বলেন তিনি।

অনলাইন গণমাধ্যম সংবাদ পরিবেশনে প্রতিযোগিতার বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে এখন সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ পরিবেশনের প্রতিযোগিতা চলে। সেটি করতে গিয়ে দেখা যায়, অনেক সময় সংবাদের গুণগতমান নষ্ট হয়। বিশেষ করে অনলাইনগুলোর ক্ষেত্রে সেটি হয়। অনলাইনগুলোকে সবার আগেই সংবাদটা পরিবেশন করতে হয়। কার আগে কে দিল সেটি নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা আছে। এটি করতে গিয়ে দেখা যায়, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ অনেক সময় হয় না। অনেক সময় ভুল সংবাদ হয়, অসত্য সংবাদ হয়। এ বিষয়ে সতর্কতা নিশ্চিত করতে পিআইবি (বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট), প্রেস কাউন্সিল, জাতীয় প্রেসক্লাব, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ঢাকা, চট্টগ্রামসহ শহর এবং মফস্বলে কর্মশালা করার পরামর্শ দেন তথ্যমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই মার্চ ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি-মাওয়া এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-এর নির্মিত ২৫টি সেতু ও তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ৬ লেন বিশিষ্ট এপ্রোচ সড়কের উদ্‌বোধন শেষে মোনাজাত করেন–পিআইডি

শীঘ্রই অনলাইন গণমাধ্যমের রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ প্রসঙ্গে ড. হাছান বলেন, অনলাইনগুলোকে আমরা রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেছিলাম এবং সাড়ে তিন হাজারের বেশি দরখাস্ত পড়েছে। আইটিটিভি, অনলাইন টিভিগুলোকেও আমরা রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছি সেখানেও পাঁচশ'র মতো আবেদন এসেছে। আমরা অনেক আগে থেকেই রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি।

তথ্যমন্ত্রী আরো জানান, 'অনলাইনগুলোর বিষয়ে কিছু সংখ্যকের তদন্ত রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমরা পেয়েছি। একটি সংস্থা থেকে এক হাজারের বেশি পেয়েছি আরেকটি সংস্থা থেকে একশ'র কম পেয়েছি। শুধুমাত্র একটি সংস্থার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া যায় না, আরেকটু অপেক্ষা করছি। প্রতিষ্ঠিত অনলাইনগুলোকে প্রথম ধাপেই দিতে চাই। সেজন্য তাদের রিপোর্টটাও যাতে আসে সেজন্য অপেক্ষা করছি।

গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী রিপোর্টের প্রশংসা করে ড. হাছান বলেন, দেশের একজন নাগরিক হিসেবে, মন্ত্রী হিসেবে নয়, কিছু গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী রিপোর্টের জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তাদের অনেক অনুসন্ধানী রিপোর্ট সমাজকে উপকৃত করে, সমাজের তৃতীয় নয়ন খুলে দেয়।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

মন্ত্রিসভার বৈঠক

২রা মার্চ: প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০২০ এবং জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০-এর খসড়া অনুমোদিত হয়

একনেকে ১০ হাজার ৪৬৮ কোটি টাকার ৮ প্রকল্প অনুমোদন

৩রা মার্চ: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী এবং একনেকের

চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর নির্মাণ প্রকল্পসহ মোট ৮টি প্রকল্পের অনুমোদন লাভ করে। এসব প্রকল্পের মধ্যে ৬টি নতুন। বাকি দুটি সংশোধনী। নতুন ও সংশোধন মিলে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১০ হাজার ৪৬৮ কোটি টাকা

বিশ্ব শ্রবণ দিবস পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় বিশ্ব শ্রবণ দিবস

৮ম জাতীয় এসএমই পণ্যমেলার উদ্‌বোধন

৪ঠা মার্চ: বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ৯ দিনব্যাপী ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্যমেলা-২০২০ উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

৫ই মার্চ: ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (এনএসটি) ফেলোশিপ এবং বিজ্ঞানী ও গবেষকদের জন্য গবেষণা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, গবেষণা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে শুধু গবেষণা করলেই হবে না। গবেষণার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তার ফলাফলটা কী সেটাও জানতে হবে। গবেষণালব্ধ ফলাফল দিয়ে দেশ ও মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে পারলেই সে গবেষণা সার্থক

জাতীয় পাট দিবস পালিত

৬ই মার্চ: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয় জাতীয় পাট দিবস-২০২০। দিবসটির স্লোগান ছিল– 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ মুজিববর্ষে বাংলাদেশ'

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত

৭ই মার্চ: বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতি, জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের স্মারক এ দিনটি ৭ই মার্চ পালন করে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

৮ই মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'প্রজন্ম হোক সমতার, সকল নারীর অধিকার'

একনেক সভা

১০ই মার্চ: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী এবং একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরসহ মোট নয়টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। এসব প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪ হাজার ১১৪ কোটি টাকা

জয় বাংলা হবে জাতীয় স্লোগান

জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস

প্রতিবছরের মতো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী পালিত হয় জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে পূর্বপ্রস্তুতি টেকসই উন্নয়নে আনবে গতি'

যাত্রাবাড়ি-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে উদ্‌বোধন

১২ই মার্চ: গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেস উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এক্সপ্রেসওয়েটি দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক এক্সপ্রেসওয়ে

বিশ্ব কিডনি দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে বিশ্ব কিডনি দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– সুস্থ কিডনি, সর্বত্র সবার জন্য।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

এক্সপ্রেসওয়ে বাংলাদেশের মাইলফলক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্‌বোধনের মধ্যে দিয়ে এক্সপ্রেসওয়ে যুগে পা রাখল বাংলাদেশ। পাশের দেশ ভারতে আগ্রা-লখনউ ৩০২ কিলোমিটার দীর্ঘ এক্সপ্রেসওয়েসহ দীর্ঘ ২৬টি এক্সপ্রেসওয়ে আছে। ২০১১ সালে শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ অংশে চালু হয়েছে এক্সপ্রেসওয়ে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই মার্চ ২০২০ শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলনকক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

বাংলাদেশে প্রায় ২২ হাজার কিলোমিটার মহাসড়ক থাকলেও এর বেশিরভাগই বিশ্বমানের নয়। সেই হতাশা কাটিয়ে উঠে এক্সপ্রেসওয়ে যুক্ত হলো দেশের সড়ক অবকাঠামোয়। এতে ছোটো-বড়ো যানবাহনের জন্য আলাদা আলাদা লেন ধরে একেদিকেই সব গাড়ির চলাচল ও ক্রসিং এড়াতে উঠেছে ফ্লাইওভার, রয়েছে আন্ডারপাস ও আধুনিক ট্রাফিক সুবিধা। ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দৃষ্টিনন্দন এই এক্সপ্রেসওয়ে উদ্‌বোধন করে তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংক অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরে যাওয়ার পর পদ্মার মতো খরস্রোতা নদীতে সেতু নির্মাণের এত বড়ো ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ নেওয়ায় মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ নিজের টাকায় বড়ো অবকাঠামো গড়ার আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছে।

মহাসড়কে গাড়ি চলতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় বিভিন্ন মোড়ে। এতে যানজট ও বিশৃঙ্খলা শুধু নয় যাত্রীদের ভ্রমণে আনন্দও থাকে না। এক্সপ্রেসওয়ে মোড়হীন, ইচ্ছামতো ডানে ও বাঁয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চলার ব্যবস্থা রয়েছে। ধীরগতির হালকা যানবাহনের জন্য মূল মহাসড়কের দুই দিকে আছে সার্ভিস লেন। এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকা থেকে মাওয়া অংশ ৩৫ কিলোমিটার, পদ্মা নদীর অন্য পার পাঁচ্চর থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের বাসিন্দাদের রাজধানী ঢাকায় যাতায়াত সুগম হবে। বরিশাল বিভাগের ছয় জেলা, খুলনা বিভাগের ১০ জেলা এবং ঢাকা বিভাগের ছয় জেলাসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২২টি জেলার মানুষ সরাসরি এই এক্সপ্রেসওয়েতে উপকৃত হবেন। বাংলাদেশের অর্থনীতির যে বিস্ময়কর উত্থান, তাতে আরো গতি আনবে এই এক্সপ্রেসওয়ে।

মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্রবন্দর

দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে সম্মতি দিয়েছে সরকার। কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়িতে ১৭ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে নির্বাহি কমিটি (একনেক) এই অনুমোদনের মধ্য দিয়ে গভীর সমুদ্রবন্দরের যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। ১০ই মার্চ শের-ই বাংলা নগরের এনইসি সম্মোলনে কক্ষে এ অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ার পারসন শেখ হাসিনা। অর্থনৈতিক কলেবর বৃদ্ধির কারণে বিদ্যমান সমুদ্রবন্দরগুলো দিয়ে চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। তাই মাতারবাড়িতে চতুর্থ বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর হবে।

ধান সংগ্রহে অসাধারণ সাফল্য

আমন মৌসুমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পরিমাণ সোয়া ৬ লাখ টন ধান সংগ্রহ করেছে সরকার। কোনোরকম বিচ্যুতি ছাড়াই এ ধান সংগ্রহে করা সম্ভব হয়েছে। কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে দেওয়ার জন্যই সরকারের এ উদ্যোগ। আমন ধানের লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৯৫ শতাংশ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সার্কভুক্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের ভিডিও কনফারেন্স

করোনা ভাইরাস

আতঙ্কিত না হয়ে আঞ্চলিকভাবে একাট্টা হয়ে উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন সার্কভুক্ত দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ। সব দেশ একইসঙ্গে কাজ করলে তবেই এ ভাইরাস সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে বলে তাঁরা একমত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই মার্চ ২০২০ গণভবন থেকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে অভিন্ন কৌশল গ্রহণে সার্কভুক্ত দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণে ১৫ই মার্চ সার্কভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের এক ভিডিও কনফারেন্সে নিজেদের অভিমত তুলে ধরেন। বিশ্বব্যাপী মহামারি রূপ নেওয়া করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সার্কভুক্ত দেশগুলোকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলায় ও নাগরিকদের রক্ষা করতে সার্কভুক্ত দেশগুলোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি সার্কভুক্ত দেশগুলোকে এই অঞ্চলের মারাত্মক করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি 'শক্তিশালী কৌশল' তৈরি এবং নিবিড়ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার আহ্বান জানান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এ রোগ মোকাবিলায় সার্ক তহবিল গঠনের প্রস্তাব দিয়ে বলেন, প্রাথমিকভাবে ভারত এক কোটি ডলার দিয়ে এই তহবিল শুরু করতে পারে। তহবিলের অর্থ ব্যয় সমন্বয়ের কাজটি ভারতের দূতাবাসগুলো করতে পারে বলেও প্রস্তাব দেন মোদি।

সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের নেতারা ও এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়ের ওপর জোর দেন এবং এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের দ্রুত উপায় খোঁজার তাগিদ দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই মার্চ ২০২০ ঢাকা আর্মি স্টেডিয়ামে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে আয়োজিত জয় বাংলা কনসার্ট উপভোগ করেন–পিআইডি

করোনা মোকাবিলায় ১২০০ কোটি ডলার সহায়তা দিবে ব্যাংক

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাস এ মহামারি মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১৫০ এর বেশি দেশে কোভিড-১৯ এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সেসব দেশ যাতে স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে তারজন্য প্রাথমিক সহায়তা হিসেবে এক হাজার ২০০ কোটি ডলার দেওয়া হবে। বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে আরো বলা হয়, প্রাথমিক এ প্যাকেজ দ্রুত ছাড় করা হবে। যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করতে পারে। বিশেষ কার মহামারি থেকে রক্ষায় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, মহামারি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া সহজ করা এ প্যাকেজ দেওয়ার উদ্দেশ্য। একইসঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনতে বেসরকারি খাতের সঙ্গে যাতে সরকার কাজ করতে পারে তাও দেখা হবে। আইডিএ, আইবিআরডি এবং আইএফসির মাধ্যমে দেশভিত্তিক এ অর্থ সরবরাহ করা হবে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ থ্রিডি হলোগ্রামে

প্রথমবারের মতো থ্রিডি হলোগ্রামে ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদর্শিত হয়। ১৯৭১ সালের সেই সময়টাই যেন নেমে এসেছিল ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে। ৭ই মার্চের ভাষণ মনে হচ্ছিল যেন একদম জীবন্ত। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে, ধরা যাবে বঙ্গবন্ধুকে।

৭ই মার্চ আর্মি স্টেডিয়ামে আয়োজিত জয় বাংলা কনসার্টে ভার্চুয়াল, হলোগ্রাফিক প্রযুক্তিতে হাজারও তরুণ-তরুণীর সামনে এভাবেই চোখের সামনে হাজির হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। শুরুতে হলোগ্রাফিক রূপে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার উপস্থিতিতে পুরো পরিবেশনাটি আরও প্রাণময় হয়ে উঠেছিল। তাঁদের মুখে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ির পরিস্থিতি, তাঁদের মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের দূরদর্শী পরামর্শের স্মৃতিচারণ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কণ্ঠে উচ্চারিত কবিতার পঙ্‌ক্তি পুরো পরিবেশকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

মুজিববর্ষে ডিজিটাল সেবা ভোগ করবে ১০ কোটি মানুষ

মুজিববর্ষে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ১০০টি সেবা চালু করা হচ্ছে। ১০ই মার্চ সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মতবিনিময় সভা শেষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক একথা জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে ডিজিটাল সার্ভিসগুলো নিশ্চিত করতে পারব। আর ২০২০ সালে মুজিববর্ষে ১০০টি সার্ভিস ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসব। যাতে অন্তত ১০ কোটি মানুষ এ বছরেই সেবাগুলো পায়।

স্বাস্থ্য খাতে দেশের প্রথম ডিজিটাল সেবা চালু হচ্ছে সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এতে রোগীদের হয়রানি, পয়সা খরচ কমবে, সঠিক চিকিৎসা ও সেবার মান বাড়ানো হবে। তিনি আরো বলেন, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রোগীর তথ্য, স্বাস্থ্য তথ্যসহ সব রেকর্ড ডিজিটালাইজেশনের আওতায় নেওয়া হচ্ছে। যা একটি নির্দিষ্ট সময় পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দেশের প্রথম 'ওয়াইফাই সিটি' সিলেট

বাংলাদেশের প্রথম 'ওয়াইফাই সিটি' হিসেবে যাত্রা শুরু করল সিলেট। নগরের ৬২টি এলাকার ১২৬টি স্থানে ফ্রি ওয়াইফাই সেবা চালুর মধ্য দিয়ে এর বাস্তবায়ন হয়। এ সেবা প্রাপ্তির ইউজার নেম 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' আর পাসওয়ার্ড 'জয় বাংলা'। নগরে থাকা যে কেউ এ সুবিধা ভোগ করতে পারবে। ১০ই মার্চ সিলেট নগরে ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধা চালু হয়। নগরে বিদ্যুৎ বিভাগের কিছু উন্নয়নকাজ চলমান থাকায় ১০০টি স্থানে এখন নগরবাসী ওয়াইফাই সেবা পাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন কাজ শেষ হলে অপর নির্ধারিত স্থানগুলোতেও এ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সিলেটকে দেশের প্রথম ডিজিটাল নগর হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

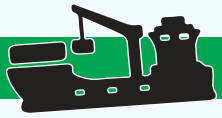

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

ভারতে রপ্তানি হলো বাংলাদেশে তৈরি এসি

ভারতে রপ্তানি হলো ওয়ালটনের তৈরি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশনার। অরিজিনাল ইক্যুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন ব্র্যান্ডকে এসিসহ বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে দিচ্ছে ওয়ালটন। এরই ধারাবাহিকতায় মেইড ইন

বাংলাদেশ ট্যাগযুক্ত আইওটি বেজ ও স্মার্ট এবং ইনভার্টার এসি ভারতে রপ্তানি হলো। ১লা মার্চ গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে এসি রপ্তানি কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

সবজি রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ৯৩ শতাংশ

দিনদিন সবজি রপ্তানি বাড়ছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যে দেখা গেছে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রথম আটমাস সবজি রপ্তানি করে আয় হয়েছে ১৩ কোটি ৯২ লাখ ডলার। যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৬২ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের একই সময়ে এ পণ্যের রপ্তানি আয় ছিল ৬ কোটি ২০ লাখ ডলার। এতে রপ্তানি আয় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯৩ দশমিক ৭ শতাংশ। দেশ থেকে আলু, ধনেপাতা, লাউপাতা, লাউগাছ, বরবটি, কাকরোল, করলা, ঝিঙে, লালশাক, বেগুন, টমেটো, পটল, কচু, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, লাউ, পেঁপে, কলা, শসা, শিম, বাঁধাকপি, মরিচ ও মূলাসহ অর্ধশতাধিক সবজি রপ্তানি হয়। এসব পণ্য সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, লন্ডন, কানাডা, দুবাই ইটালিসহ ৫০টির ও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ১লা মার্চ ২০২০ গাজীপুরের চন্দ্রায় Exporting Smartphone To USA-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এ সময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে ফেব্রুয়ারি তাঁর কার্যালয়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নবম শ্রেণি থেকেই বিষয়ভিত্তিক বিভাজন (বিজ্ঞান-কলা-বাণিজ্য) তুলে দেওয়ার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এখন সব সাবজেক্টই বিজ্ঞানভিত্তিক। বিজ্ঞানের বাইরে কিছু নেই। বিজ্ঞান না পড়ার ফলে অনেক বিষয়েই শিক্ষার্থীরা পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

তিনি আরো বলেন, আমাদের জনসংখ্যাকে আমরা যদি কারিগরি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ করে গড়তে পারি তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না, বরং আমরা অন্য দেশকে সাহায্য করতে পারব। প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলায় তাঁর সরকারের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলেন, একইসঙ্গে প্রত্যেক উপজেলায় কারিগরি স্কুল, কলেজ এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন ভালোভাবে নজরদারি করতে পারে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের সর্বোচ্চ নম্বর/সিজিপিএ প্রাপ্তদের হাতে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮ তুলে দেন। দেশের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭২ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে এ পদক প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ তাঁর কার্যালয়ে 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক-২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন–পিআইডি

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে মার্কিন বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করবেন। বাণিজ্যমন্ত্রী ৩রা মার্চ ২০২০ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে Christopher Wilson-এর নেতৃত্বে ঢাকায় সফররত দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া অঞ্চলের মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সহজ কাস্টমস শুল্ক ও কর প্রক্রিয়া এবং ব্যবসাবান্ধব বাণিজ্যনীতি চায় যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের কারখানাগুলো ইতোমধ্যে কম্প্লায়েন্স হয়েছে। শ্রম আইন সংশোধন করে সময়োপযোগী করা হয়েছে। আমদানি-রপ্তানির সুবিধার জন্য পোর্টগুলো উন্নত করা হয়েছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে উভয় দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে টিকফা বৈঠকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির সঙ্গে ৩রা মার্চ ২০২০ তাঁর অফিস কক্ষে South and Central Asia-এর Assistant US Trade Representative Chirstopher Wilson সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

Christopher Wilson বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। এজন্য বাংলাদেশের শুল্ক প্রক্রিয়া, কর, ই-কমার্স ইত্যাদি বিষয়গুলো আরো সহজ হওয়া প্রয়োজন। পার্টনারশিপেও মার্কিন যুক্তরাষ্টের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে পারেন। বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা প্রদান-সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আগামী টিকফা বৈঠকে আলোচনার সুযোগ রয়েছে।

ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভ প্রতিনিধিদলে ছিলেন ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত Earl R Miller, পলিটিক্যাল অ্যান্ড কমার্সিয়াল কাউন্সিলর ব্রেন্ট ক্রিসটেনসেন, ডেপুটি ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভ ফর সাউথ অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়া জেবা রিয়াজউদ্দিন, ভারতের ইউএস দূতাবাসের বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি সিনিয়র কমার্সিয়াল অফিসার গ্রিজোরি টেভস। এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মোঃ ওবায়দুল আজম, অতিরিক্ত সচিব ও ডব্লিউটিও-এর মহাপরিচালক মোঃ কামাল উদ্দিনসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

স্টার্টআপে ২০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এসেছে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, দেশে বিগত চার বছরে স্টার্টআপে ২০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এসেছে। স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্টার্টআপদের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে সরকার মেন্টরিং, কোচিং ও ফান্ডিং-সহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। প্রতিমন্ত্রী ৩রা মার্চ ২০২০ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আইডিএলসি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড ১-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করার লক্ষ্যে চলতি বাজেটে এক কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। তাদের জন্য সিড স্টেজে এক লাখ থেকে দশ লাখ টাকা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রোথ স্টেজে ১ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: এস আর সবিতা

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৮ই মার্চ নানা আনুষ্ঠানিকতায় উদ্‌যাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। জাতিসংঘ এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে– 'আমি প্রজন্মেও সমতা: নারী অধিকারের প্রতি সচেতনতা।' অবশ্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'প্রজন্ম হোক সমতায়, সকল নারীর অধিকার।'

দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেছেন, সভ্যতার শুরু থেকে সব কাজে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমানে সরকার নারী-পুরুষের সমতা বিধানে নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়নসহ নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন, জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে সহযাত্রী করা হয়েছে-এর অংশ হিসেবে সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে।

দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেছে নানা কর্মসূচি। রাজধানী ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার উদ্‌বোধন করেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই মার্চ ২০২০ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিভিন্ন বয়সি নারীর এ সমাবেশের আয়োজন করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী পাঁচ জয়িতার হাতে পদক তুলে দেন। রাত ১২টার পরেই নারীর সমতা চেয়ে হাজারো প্রদীপ জ্বলে উঠে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার চত্বরে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আধার ভাঙার শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যৌথভাবে আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকি।

রাঁধুনী কীর্তিমতী সম্মাননা পেলেন চার নারী

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য চার কীর্তিমতী নারীকে রাঁধুনী কীর্তিমতী সম্মাননা দিল স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড। ৭ই মার্চ রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

কীর্তিমতী চার নারীর একজন রাজশাহীর আলেয়া বেগম। তিনি পরিচয়হীন অসহায় ও অসুস্থ মানুষের সেবা করেন। সাংবাদিকতায় সম্মাননা পেয়েছেন চ্যানেল আইয়ের রংপুরের সাংবাদিক মেরিনা লাভলী। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পুনর্বাসনে কাজ করে কীর্তিমতী উদ্যোক্তা সম্মাননা পেয়েছেন রাজধানী ওয়াহিদা খানম, আর ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখায় কীর্তিমতী ক্রীড়াবিদ সম্মানা পেয়েছেন জাতীয় নারী ফুটবলার সাতক্ষীরার সাবিনা খাতুন।

আরটিভি-জয়া আলোকিত নারী সম্মাননা

ছয়জন নারী আরটিভি-জয়া আলোচিত নারী ২০২০ সম্মাননা দিয়েছে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভি। ৬ই মার্চ রাজধানীতে অষ্টমবারের মতো আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। এ বছর সম্মাননা পেলেন কৃষিবিজ্ঞানী তমাল লতা আদিত্য, স্কাউটিং সংগঠক নাজমা শামস্, নারী উদ্দ্যোক্তা বিবি আমেনা, চ্যালেঞ্জিং পেশা (মোকানিক) রাবেয়া সুলতানা রাব্বি, সমাজ সেবক হাজেরা বেগম ও ক্রীড়াবিদ্ (রুসলিং) শিরিন সুলতানা।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

দুস্থ পরিবারের শিশুদের মাঝে শিশু খাদ্য বিতরণ

করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন এবং অসহায় পরিবারের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শিশুদের জন্যও ভিন্নভাবে সহায়তাকরার উদ্যোগ নেয় সরকার। সারাদেশের দুস্থ পরিবারের শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতিলক্ষ্য রেখে সরকার বিনামূল্যে এ শিশুখাদ্য প্রদান করেছে। এ সহায়তা দেশের

প্রতিটি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নে বিতরণ করা হয়েছে। সারাদেশের মতো পটুয়াখালী সদর উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে দুস্থ পরিবারের শিশুদেরজন্য সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। ২৭শে এপ্রিল সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লতিফা জান্নাতী এসব উপকরণ বিতরণ করেন। এসময় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউনিয়নের সচিবদের হাতে মোট ৬৪০ পরিবারের জন্য শিশুখাদ্য হস্তান্তর করা হয়।

হতদরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

করোনা পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে অসহায় কর্মহীন ও হতদরিদ্রদের মাঝে আজ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে দিনাজপুরে কর্মহীন অসহায় ৫ শতাধিক দরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

লবণাক্ততা সহনশীল প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উপকূলবর্তী এলাকায় কৃষি বিপ্লব

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিজ্ঞানীগণ লবণাক্ততা সহিষ্ণু উন্নতজাতের ধান ব্রি ৬৭, ভুট্টা সূর্যমুখী, গম, বার্লি এবং বিনা চাষে আলু, রসুনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন এবং ইতোমধ্যে এসবের

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার ১১ই মার্চ ২০২০ তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আমন ধান সংগ্রহ সমাপন্তে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী সম্পন্ন করেছেন। উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তি এবং ফসল চাষিরা চাষ করার সুযোগ পাবেন। এর মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল-সহ উপকূলবর্তী এলাকায় কৃষি বিপ্লব ঘটবে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। মন্ত্রী ১২ই মার্চ খুলনার দাকোপ উপজেলার চরডাঙ্গায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন শেষে এ মন্তব্য করেন। দাকোপ উপজেলায় চরডাঙ্গায় প্রায় ১০০ বিঘা প্লট জমির উপর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রদর্শনী প্লট রয়েছে।

পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী বলেন, যুগযুগ ধরে উপকূলীয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এসব জমিতে সারা বছরে একবার ফসল হয়। আমন ধান তোলার পর বছরের বাকি সময়টা মাঠের পর মাঠ জমি অলস পড়ে থাকে। লবণাক্ততার কারণে এসব অঞ্চলে বছরে দুইবার বা তিনবার ফসল চাষ করা যায় না। এসব বিবেচনায় আমাদের লক্ষ্য ছিল কীভাবে, কী ফসল লাগালে, কীভাবে পরিচর্যা করলে এই প্রতিকূলতার মাঝে ফসল উৎপাদন করা যায়। আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনে কাজ করে আসছিলেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে উন্নত মানের এসব জাত উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে নতুন জাতের ব্রি-৬৭ ধান আবিষ্কার করেছে। এটির উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি। মন্ত্রী বলেন, উপকূলীয় এলাকা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে ফসল উৎপাদনের সমস্যা দুটি: লবণাক্ততা এবং সুপেয় পানির অভাব। যে খালগুলো দিয়ে সুপেয় পানি আসতো সেগুলো পলিজমে ভরাট হয়ে গেছে। সেজন্য খালগুলো পুনঃখননের উদ্যোগ নেওয়া হবে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনে আমরা সক্ষম হয়েছি। চাষিরা এ সকল ফসলের চাষ করলে জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন হবে, দারিদ্র্য বিমোচন ও অভাব দূর হবে।

আমন ধান কেনায় রেকর্ড

এবার আমন মৌসুমে ধান কেনার ক্ষেত্রে রেকর্ড করেছে খাদ্য অধিদপ্তর। সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রায় ৬ লাখ ২৭ হাজার মেট্রিক টন আমন ধান কেনা হয়েছে। ১১ই মার্চ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আমন ধান সংগ্রহ নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এসব কথা বলেন। এ সময় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।

আগামী বোরো মৌসুমে অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকের কাছ থেকে ৬৪ জেলার একটি করে উপজেলায় ধান ও ১৬ উপজেলায় মিলারদের কাছ থেকে চাল কেনার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও মন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রকল্পের আওতায় আমন অ্যাপের মাধ্যমে ১৬টি উপজেলার ধান কেনায় সফলতা আসায় আগামী বোরো মৌসুম থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিববর্ষের আলো জ্বলবে চরসোনারামপুরে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ বন্দর থেকে আধা কিলোমিটার দূরে মেঘনা নদীর বুকে জেগে ওঠা চরের নাম চরসোনারামপুর। শতবছর ধরে মহস্যজীবী কিছু পরিবারের আবাস গড়ে উঠেছে এ চরে। বর্তমানে প্রায় চার হাজার লোকের বসবাস। চরটির পূর্ব পাশে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বন্দর ও শিল্প এলাকা আশুগঞ্জ। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে মেঘনার দুই

পাড়ে জ্বলে ওঠে হাজারো বাতি। মুজিববর্ষে এ চরের বাসিন্দারা পাচ্ছেন বিদ্যুতের আলো। এরই মধ্যে বসেছে বিদ্যুতের খুঁটি। বিদ্যুৎ আসবে এর আয়োজন দেখে খুশিতে আত্মহারা চরের লোকজন। প্রায় ২০০ বছর আগে মেঘনার বুকে জেগে ওঠে এ চর। আশুগঞ্জ উপজেলা সদর ইউনিয়নের আওতায় হওয়ায় নামকরণ করা হয় চরসোনারামপুর। চারদিকে হাজারও বাতির আলোর ঝলকানি। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ঘোষণায় চরবাসীর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। ভৌগোলিক কারণে চরটিতে বিদ্যুতায়ন কঠিন। সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে সেখানে পৌঁছবে ১১ কেভি লাইন। প্রায় এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়া হবে ওই চরে।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ৩রা মার্চ ২০২০ বিয়াম ফাউন্ডেশনে 'বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)-এর ফিডব্যাক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

অফগ্রিড এলাকা বিদ্যুতের আওতায়

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই সারা দেশে অফগ্রিড এলাকা বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় আনা হবে। এজন্য দেশের চারটি বিতরণ কোম্পানিকে অফগ্রিড এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চার কোম্পানি হচ্ছে– বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিকে (ওজোপাডিকো) ডিসেম্বরের মধ্যে অফগ্রিড এলাকাকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ।

রাঙ্গাবালি আলোকিত সৌর বিদ্যুতে

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলা থেকে প্রায় ২০ কিমি. দূরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের নাম চরমোন্তাজ ইউনিয়ন। চারদিকে নদী আর মাঝখানে দ্বীপ। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষা এ ইউনিয়নে নেই বিদ্যুৎ সংযোগ। তবু সন্ধ্যা হলে জ্বলে ওঠে বৈদ্যুতিক বাতি যার শক্তি যোগায় সৌর বিদ্যুৎ। সৌর বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত পুরো গ্রাম ও বাজার। শুধু তাই নয় উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামই এখন সৌর বিদ্যুৎ নির্ভর। সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে সূর্যের আলো গ্রামের প্রতিটি সোলার প্যানেলে রেখে যায় তার কিছু শক্তির অংশ। যা ব্যবহার করে গ্রামের পর গ্রাম হয়ে উঠছে আলোকিত।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

জনপ্রশাসনকে আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জনপ্রশাসনকে আরো দক্ষ করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। ৩রা মার্চ ২০২০ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বিনিময়ের জন্য আয়োজিত ফিডব্যাক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শামিল হয়েছে। এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখে দেশকে আরো সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে জনপ্রশাসনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জনপ্রশাসনে কর্মরত প্রত্যেক কর্মচারীকে আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। দেশের আমলাতন্ত্রকে আরো সক্ষম করে গড়ে তুলতে না পারলে উন্নয়নের এই ধারা ব্যাহত হবে।

রাজস্ব খাতে ৪৩৭টি অস্থায়ী সহকারী সমাজসেবা অফিসারের পদ সৃজন

১৮ই মার্চ ২০২০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৮ম সভায় জানানো হয়, সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় ১১২টি ইউনিয়নে সমাজকর্মীর শূন্য পদের নিয়োগের

প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং শিগগির পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়ার আলোকে দ্রুত একটি স্বচ্ছ নিয়োগ কার্যক্রমের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

প্রথম পর্যায়ে ২১৩টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২৪টিসহ রাজস্ব খাতের মোট ৪৩৭টি সহকারী সমাজসেবা অফিসারের পদ অস্থায়ীভিত্তিতে সৃজন করা হয়েছে বলেও সভায় জানানো হয়। এছাড়া সমাজসেবা

অধিদফতরের প্রথম শ্রেণির ৩৮টি শূন্য পদের মধ্যে ৩৬টি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ৩৪৩টি শূন্যপদের মধ্যে ৭০টি পদের নিয়োগ প্রস্তাব পিএসসিতে প্রক্রিয়াধীন। ২৬২টি সমাজসেবা অফিসারের পদ নিয়োগবিধিতে না থাকায় নিয়োগবিধি সংশোধনের কাজও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে চালু হলো জলবায়ু বাস

মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ১৫ই মার্চ ঢাকায় জলবায়ু বাসের উদ্‌বোধন করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এই বাসের উদ্‌বোধন করেন। এসময় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা কর্মসূচি হিসেবে জলবায়ু বাসের উদ্‌বোধন করা হয়। সারা দেশের প্রত্যেক জেলা উপজেলায় এই বাস যাবে এবং ছাত্রছাত্রীদের জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে হচ্ছে, কিভাবে দেশের পরিবেশ রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে সচেতন করা হবে।

ডিজিটাল এলইডি ডিসপ্লে, মোবাইল থ্রিডি সিনেমা সিস্টেম, ইন্টারক্টিভ কিয়স্ক, গ্রিন এনার্জির জন্য সোলার প্যানেল, ওয়াইফাই ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তথ্য সংবলিত আর্কাইভসহ বিশেষ এ জলবায়ু বাসটি তৈরি করা হয়েছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে তৈরিকৃত সচেতনতামূলক টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, রেডিও বিজ্ঞাপন, থিম সং এবং ডকুমেন্টারি জলবায়ু বাসের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রচার করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন বিষয়ে প্রণীত ব্যান্ডিং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এক কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা ব্যয়ে সংগৃহীত জলবায়ু বাস এর কার্যক্রম উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ জলবায়ু বাস।

জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী জানান, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বিসিসিএসএপি-২০০৯ এ বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব উদ্যোগে রাজস্ব বাজেট থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) গঠন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

পরিবেশ মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন ১৫ই মার্চ ২০২০ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'জলবায়ু বাস'-এর কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

সড়ক-মহাসড়কে সফল হাইওয়ে পুলিশ

২০০৫ সালে ৫৫৭ জন জনবল নিয়ে প্রাথমিক যাত্রা শুরু করে পুলিশের বিশেষায়িত 'ইউনিট হাইওয়ে পুলিশ' বাংলাদেশ পুলিশের সফল আরেকটি ইউনিট। পুলিশের এই ইউনিট সড়ক-মহাসড়কে যানজট নিরসন থেকে শুরু করে অপরাধ নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখে সফলতা অর্জন করেছে ইতোমধ্যেই। যাত্রা শুরুর পর থেকেই সড়ক-মহাসড়কে নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালন এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশে মহাসড়ক থেকে থ্রি-হুইলার অপসারণের মাধ্যমে দুর্ঘটনা কমিয়ে আনায় অনেকটাই সন্তুষ্ট মহাসড়ক ব্যবহারকারীরা। মহাসড়কে নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে চলাচলই একমাত্র ভিশন এই ইউনিটের। পুলিশের এই ইউনিট সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস এবং মানুষের জীবন রক্ষা, প্রতিবন্ধকতা অপসারণপূর্বক মহাসড়কে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন করা, চালক, হেলপার এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন, স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে নিয়ে দায়িত্ব পালন, মহাসড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ নৈতিকতা, সৌজন্যমূলক আচরণসহ পেশাদারিত্বের সঙ্গে আইন প্রয়োগ করার মিশন বাস্তবায়নে ইতোমধ্যেই সফলতার নজির দেখিয়েছে।

এদিকে যাত্রা শুরুর পরবর্তীকালে পুলিশের এই ইউনিটটি জেলা পুলিশ থেকে প্রাপ্ত ১৪৮৫ জন জনবল নিয়ে ২৪টি হাইওয়ে প্রস্তাবিত থানা ও ৪৮টি হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে জনবল বৃদ্ধি করে। এরপর ২০১২ সালে ১৫০ জন এবং ২০১৫ সালে যুক্ত হয় ৬২৮ জন জনবল।

৬২৮ জন জনবল মঞ্জুরির পরিপ্রেক্ষিতে গাজীপুর রিজিয়নকে বিভক্ত করে সিলেট রিজিয়ন ও মাদারীপুর রিজিয়নকে বিভক্ত করে গঠন করা হয় যশোর রিজিয়ন। ২০১৭ সালে হাইওয়ে পুলিশ, গাজীপুর রিজিয়নের আওতাধীন জামালপুর জেলার বকশিগঞ্জে বকশিগঞ্জ হাইওয়ে থানা নামে ৪১ জনবলের সমন্বয়ে হাইওয়ে পুলিশের অনুকূলে একটি নতুন থানা সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে অঞ্চলসমূহের পরিবর্তে রিজিয়ন নামকরণ করা হয়েছে এবং হাইওয়ে পুলিশের বর্তমান জনবল সংখ্যা ২৮৬১ জন।

এদিকে ছয়টি হাইওয়ে রিজিয়ন, ১০টি সার্কেল, ৩৬টি থানা, ৩৭টি হাইওয়ে ফাঁড়িসহ এ ইউনিটের মোট থানা/ফাঁড়ির বর্তমান সংখ্যা ৭৩টি। এছাড়া হাইওয়ে কমিউনিটি পুলিশিং সংক্রান্ত কমিটির সংখ্যা ১৪০৭ এবং এ কমিটির সদস্য সংখ্যা বিশ হাজার ৮৩২ জন। ২৮৬১ জন জনবল নিয়ে ৭৩টি থানা/ফাঁড়ির মাধ্যমে হাইওয়ে কমিউনিটি পুলিশিংয়ের বিশ হাজার সদস্য নিয়ে একযোগে সড়ক-মহাসড়কে নিজেদের ভিশন বাস্তবায়নে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে পুলিশের বিশেষায়িত এ ইউনিট।

নতুন ৪টি বাস পেল ঢাকা কলেজ

শিক্ষার্থীদের পরিবহণ সংকট নিরসনে মাজিদ মোল্লা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট দানবীর আব্দুল কাদির মোল্লার পক্ষ থেকে ঢাকা কলেজকে এই চারটি নতুন বাস দেওয়া হয়। ১৫ই মার্চ দুপুরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে লাল ফিতা কেটে বাসগুলোর উদ্‌বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক নেহাল আহমেদ। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন– কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক এটিএম মঈনুল হোসেন ও শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. আবদুল কুদ্দুস সিকদার প্রমুখ।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

ছয় দেশ থেকে আসা যাত্রীদের কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চীন, ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ইরান ও থাইল্যান্ড এই ছয়টি দেশ থেকে বাংলাদেশে আসা যাত্রীদের কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। ৮ই মার্চ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহারিয়ার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এ নির্দেশনার কথা জানান।

ওই ছয় দেশ থেকে আসা যাত্রীদের জ্বর না থাকলেও তাদের বাধ্যতামূলক নিজ বাড়িতে বা তারা যেখানে থাকবে, সেখানে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। তবে বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় যদি কোনো যাত্রীর শরীরে তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা এর বেশি থাকে, তাহলে তাকে সরাসরি কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে।

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে প্রয়োজন সচেতনতা

সহজলভ্য কোনো চিকিৎসা না থাকায় থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য বিয়ের আগে প্রত্যেকের উচিত রক্ত পরীক্ষা করা। দুই বাহকের মধ্যে বিয়ে নিরুৎসাহিত করা গেলে এই রোগ প্রতিহত করা সম্ভব। এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। ১৩ই মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব বলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। মুজিববর্ষ উপলক্ষে থ্যালাসোমিয়া রোগে নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ থ্যালোসেমিয়া ফাউন্ডেশন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বিপুল সংখ্যক থ্যালাসেমিয়া বাহক বিয়ের মাধ্যমে প্রতিবছর নতুন করে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুর জন্ম দিচ্ছে। বিয়ের আগে রক্ত

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক ১৪ই মার্চ ২০২০ ঢাকা শিশু হাসপাতালে হাম-রুবেলা টিকাদান কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

পরীক্ষা করে দুই বাহকের মধ্যে বিয়ে রোধ করে থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন উদ্‌বোধন

২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশে হাম-রুবেলা ভাইরাসের সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে 'জাতীয় হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন ২০২০' উদ্‌বোধন করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক। ১৪ই মার্চ ঢাকা শিশু হাসপাতালে মিলনায়তনে এ ক্যাম্পেইন উদ্‌বোধন করা হয়।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ক্যাম্পেইনটি পরিচালিত হবে দুই ভাগে। প্রথম ভাগে ১৮ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত সারা দেশের ১ লাখ ৭৩ হাজার ২৮৯টি বিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি বা সমপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এক ডোজ করে হাম ও রুবেলার (এমআর) টিকা দেওয়া হবে (আগে টিকা দেওয়া হলেও)। দ্বিতীয় ভাগে ২৮ মার্চ থেকে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত ২ লাখ ৪৪ হাজার ৪৪৪ টি নিয়মিত, স্থায়ী ও অতিরিক্ত টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে যেসব শিশু বিদ্যালয়ে যায় না কিংবা যারা প্রথম ভাগে টিকা নিতে পারেনি, তাদের টিকাদান নিশ্চিত করা হবে। ক্যাম্পেইনটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে বাস্তবায়ন করেছে ইউনিসেফ, বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

২৩৮ কিলোমিটার পাতাল রেল ঢাকায়

ঢাকায় ২৩৮ কিলোমিটার পাতাল রেল নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং প্রাথমিক নকশা প্রণয়ন কাজে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের এ প্রকল্পের সমীক্ষার জন্য মোট ব্যয় ধরা আছে ৩১৭ কোটি ৯৪ লাখ টাকা।

৪ঠা মার্চ শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ক্রয় প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়। পাতাল রেল নির্মাণের সমীক্ষায় পরামর্শের কাজ করবে স্পেনের টেকনিক কোম্পানি। বৈঠকে অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাসিমা সুলতানা। অতিরিক্ত সচিব বলেন, ঢাকার মাটি পাতাল রেল (আন্ডারগ্রাউন্ড সাবওয়ে) নির্মাণের উপযোগী, যা জাপানের ওসাকা শহরের অনুরূপ। এ কারণে ওসাকা শহরের মতোই রাজধানীতে মাটির ২০-২৫ মিটার গভীরে পাতাল রেল নির্মাণের পরিকল্পনা নিতে যাচ্ছে সরকার। প্রথমে ঢাকায় ৯০ কিলোমিটার পাতাল রেল নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে এখন পুরো ঢাকায় ২৩৮ কিলোমিটার পাতাল রেল নির্মাণ করা হবে। এজন্য সমীক্ষা ব্যয়ও বেড়েছে। প্রথমে মূল সমীক্ষা ব্যয় ছিল ২১৯ কোটি ৪৪ লাখ টাকা।

প্রথমে ঢাকার পাতাল রেল (সাবওয়ে) পথ নির্মাণের লক্ষ্যে চারটি রুট চিহ্নিত করেছিল সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়। কিন্তু এখন চারটি রুটের পরিবর্তে ঢাকার মাটির নিচের একাধিক পাতাল রেল রুট নির্মাণ করা হবে। এজন্য প্রাথমিকভাবে সিজিসিলটি স্ট্যাটি বা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প সংশোধন করতে যাচ্ছে সরকার।

বঙ্গবন্ধু রেলসেতু

চলমানব 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলসেতু নির্মাণ' প্রকল্পের নতুন করে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ হাজার ৪৬ কোটি টাকা। এখন প্রকল্পের মোট ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ৭৮০ কোটি টাকা। মূল প্রকল্পের ব্যয় ছিল ৯ হাজার ৭৩৪ কোটি টাকা। ৩রা মার্চ শেরে বাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যয় বাড়া নিয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, জাইকা নতুন করে প্রকল্প পর্যালোচনা করে দেখেছে ব্যয় বাড়বে। এ কারণেই প্রকল্পের ব্যয় বাড়ানো হচ্ছে। রেল সেতু নির্মাণে ব্যয় বাড়ছে ৭ হাজার ৪৬ কোটি টাকা। বাড়তি ব্যয়ের ৪ হাজার ৪২৮ কোটি টাকা ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে জাপান সরকারের উন্নয়ণ সংস্থা (জাইকা) প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ২০১৬ সালে।

নির্মাণ কাজের মূল্য বৃদ্ধি, নতুন কাজ হিসেবে ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ও অন্যান্য ফ্যাসিলিটি ভাড়ার সংস্থান, একটি জাদুঘর ও পরিদর্শন বাংলা নির্মাণ, ব্যাংক চার্জ বাড়ছে প্রকল্পে। এছাড়া সিগন্যালিং ও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা মার্চ ২০২০ শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

টেলিকমিউনিকেশন ওয়ার্কস এবং প্যাকেজ ৩-এর কাজের ব্যয় বাড়ার বিষয়ে জাইকাকে জানানো হয়েছে। তাই বাড়তি ঋণ দেবে জাইকা। সংশোধিত প্রকল্পে ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শক খাতে সরকারি তহবিল থেকে ২১২ কোটি টাকাসহ মোট ৮২৭ কোটি ৮১ লাখ টাকা বাড়ছে। আবার সরকারি অর্থে ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট পরামর্শক বাবদ ৫২ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবে জমি অধিগ্রহণ, জমি ব্যবহার ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় বাবদ মোট ৩৪৬ কোটি ৬৬ লাখ টাকার মোট ৩৪৬ কোটি ৬৬ লাখ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

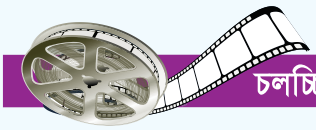

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধুর বায়োপিকে শুভ-ফারিয়া-তিশা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিকের ৫০টি চরিত্রের জন্য অভিনয়শিল্পীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএফডিসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করবেন চিত্রনায়ক আরিফিন শুভ। নুসরাত ইমরোজ তিশা করবেন বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী রেনুর বড়োবেলার চরিত্রে এবং শেখ হাসিনার ছোটোবেলার চরিত্রে অভিনয় করবেন নুসরাত ফারিয়া। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর বড়ো মেয়ে শেখ হাসিনার আরো দুই বয়সের চরিত্রে অভিনয় করবেন জান্নাতুল সুমাইয়া এবং ওয়ানিয়া জারিন আনভিতা। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ছবিটির নাম নির্ধারণ করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু'। বিএফডিসির এমডি নুজহাত ইয়াসমিন স্বাক্ষরিত তালিকায় মোট ৫০ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ছবির অন্যান্য চরিত্রে যারা অভিনয় করবেন তাদের সবার নাম প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ প্রযোজনায় ছবিটি নির্মিত হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন ভারতীয় গুণী নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল।

বঙ্গবন্ধুর বায়োপিকে ঐতিহাসিক আরো কিছু চরিত্রে অভিনয় করবেন দেশের জনপ্রিয় এবং খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। রাইসুল ইসলাম আসাদ করছেন আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর চরিত্রে, সায়েম সামাদ করছেন সৈয়দ নজরুল ইসলামের চরিত্রে, চিত্রনায়ক ফেরদৌস করছেন তাজউদ্দীন আহমেদ, শহীদুল আলম সাচ্চু করছেন একে ফজলুল হক, সমু চৌধুরী করছেন কামারুজ্জামান, তৌকির আহমেদ করছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং ফজলুর রহমান বাবু করছেন খন্দকার মোশতাক আহমেদের চরিত্রে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিন ১৭ই মার্চ থেকে ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট ব্যাপ্তির সিনেমাটির শুটিং শুরু হবে। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় এই চলচ্চিত্রটির জন্য বাজেট নির্ধারিত হয়েছে ৩৫ কোটি টাকা। এই বাজেটের ৬০ ভাগ দিচ্ছে বাংলাদেশ ও ৪০ ভাগ ভারত।

বায়োপিকটি নির্মাণে শ্যাম বেনেগালের সহযোগী পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন দয়াল নিহালানি। চিত্রনাট্য করেছেন অতুল তিওয়ারি ও শামা জায়েদি। শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব পেয়েছেন নীতিশ রায়। কস্টিউম ডিরেক্টর হিসেবে আছেন শ্যাম বেনেগালের মেয়ে পিয়া বেনেগাল। সব ঠিক থাকলে ২০২১ সালের ১৭ই মার্চের আগেই মুক্তি দেওয়া হবে সিনেমাটি।

বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে তানভীর মোকাম্মেল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল। এ ব্যাপারে তানভীর মোকাম্মেল তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্প্রতি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। 'মধুমতী পারের মানুষটি: শেখ মুজিবুর রহমান' নামের প্রামাণ্যচিত্রটির চিত্রগ্রহণের কাজ করবেন রাকিবুল হাসান এবং প্রধান সহকারী পরিচালক হিসেবে

কাজ করবেন সৈয়দ সাবাব আলী আরজু। সহকারী পরিচালক হিসেবে থাকবেন রানা মাসুদ ও সগীর মোস্তফা। উত্তম গুহ ছবিটির শিল্প নির্দেশনার কাজ করবেন এবং সৈয়দ সাবাব আলী আরজু আবহ সংগীত করবেন।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রদর্শনীতে নিজের তোলা বঙ্গবন্ধুর ছবির পাশে দাঁড়িয়ে আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ছেঁউড়িয়ায় মরমি গানের সুর

নিগম বিচারে সত্য গেল যে জানা/মায়েরে ভজিলে হয় তার বাপের ঠিকানা। কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় লাল আখড়াবাড়ি চত্বরে ৮ই মার্চ লালন একাডেমির আয়োজনে শুরু হয় তিন দিনব্যাপী লালন

স্মরণোৎসব। সারা দেশ থেকে সাধু বাউলেরা জড়ো হয় আখড়াবাড়ি চত্বরে। এ অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেনের সভাপতিত্বে আমন্ত্রিত অতিথিরা আলোচনায় অংশ নেন। মূল মঞ্চে আলোচনা শেষে চলে লাল একাডেমির শিল্পীদের গান। সারা দেশ থেকে লালনভক্ত অনুসারীরা উপস্থিত হন এ স্মরণোৎসবে।

নাসির আলী মামুনের প্রদর্শনী জয় বঙ্গবন্ধু

বিশ্বের বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির মুখচ্ছবি ধারণ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন নাসির আলী মামুন। সেই খ্যাতিমান ব্যক্তিদের তালিকায় আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও। খুব কাছ থেকে তাঁর ছবি তুলেছেন নাসির আলী মামুন। জাতির পিতার কিছু দুর্লভ ছবি ফ্রেমে বন্দি করে রেখেছিলেন তিনি। ধানমন্ডির আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের লা গ্যালারিতে ৬ই মার্চ থেকে শুরু হয় নাসির আলী মামুনের একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী 'জয় বঙ্গবন্ধু'। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত জ্যঁ মারা সু। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন চিত্রকর শাহাবুদ্দিন আহমদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নাসির আলী মামুনের স্ত্রী ও ছেলে। বঙ্গবন্ধুর মোট ২৫টি আলোকচিত্র নিয়ে এ প্রদর্শনী চলে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত।

জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান দিয়ে ৬ই মার্চ তাঁর স্মৃতিধন্য সিরাজগঞ্জে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় ৩৯তম জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন। রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদের আয়োজনে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে এর উদ্‌বোধন করেন ভাষা সংগ্রামী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সৈনিক কামাল লোহানী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান। প্রদীপ প্রজ্বলনের পর রবিরশ্মি শীর্ষক সুবচন পাঠ করেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশ্বজিৎ ঘোষ। এ সম্মেলনে প্রথিতযশা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ফাহমিদা খাতুনকে দেওয়া হয় রবীন্দ্র পদক-২০২০।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকার সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তামাকবিরোধী সাইন বোর্ড স্থাপন করা হবে

ঢাকা জেলার সব সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে তামাকবিরোধী সাইন বোর্ড স্থাপন করা

হবে। ১১ই মার্চ সিভিল সার্জন কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাঃ মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকদের দ্রুত সম্ভব তামাকবিরোধী সাইন বোর্ড স্থাপনের নির্দেশ দেন। আইন অনুসারে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে সম্পূর্ণ তামাকমুক্ত করতেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শতভাগ তামাকমুক্ত এবং সেখানে তামাকবিরোধী সাইনবোর্ড থাকা বাধ্যতামূলক।

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, মাদক করব পরিহার

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, মাদক করব পরিহার– এই প্রতিপাদ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ১২ই মার্চ দিনাজপুর জেলা কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল আলম বলেন, মাদক সমাজকে গ্রাস করছে, এই মাদকের গ্রাস থেকে বিরত রাখতে সরকার কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ মাদক শুধু নিজেকে ধ্বংস করে না, সমাজ ও দেশকেও ধ্বংস করে। আসুন আমরা মাদককে নির্মূল করে একটি সুন্দর জাতি গঠন করতে, সরকারের কর্মসূচি সফল করতে সার্বিক সহযোগিতা করি। সভা শেষে কারান্তরীণ বন্দিদের মাদকবিরোধী শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান অতিথি দিনাজপুর জেলা প্রশাসক মোঃ মাহমুদুল আলম।

প্রতিবেদনঃ জান্নাত হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশুদের করোনা সতর্কতায় স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা

করোনা ভাইরাস নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে শিশুদের স্বাস্থ্য সতর্কতায় ১৮ই মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। ১৬ই মার্চ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। করোনা সতর্কতায় ইতোমধ্যে স্কুল-কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কমে আসছিল। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম ১৫ই মার্চ তাঁর প্রতিষ্ঠানে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ উপস্থিতির কথা জানান।

শিশু সুরক্ষায় বিদ্যালয় পরিচালনার নতুন নির্দেশনা তিন সংস্থার

নভেল করোনা ভাইরাস বা কভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। বিশ্বের দেড় শতাধিক দেশে এ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ভাইরাস সংক্রমণ থেকে শিশুদের সুরক্ষা ও বিদ্যালয়কে নিরাপদ রাখা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক তিন সংস্থা ১০ই মার্চ এক নতুন নির্দেশনা দিয়েছে। এ তিন সংস্থা হলো– ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (আইএফআরসি), ইউনিসেফ ও ডাব্লিউএইচও।

বিদ্যালয়কে নিরাপদ রাখতে জরুরি বিষয় এবং ব্যবহারিক যাচাই তালিকা সরবরাহ করা হয়েছে এই নির্দেশিকায়। এছাড়া শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধার জন্য কীভাবে জরুরি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রয়োগ করতে হবে সে বিষয়ে জাতীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয় বন্ধের ক্ষেত্রে, শিশুদের পড়াশোনা ও সুস্থতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব কমানোরও সুপারিশ দেওয়া হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। এর অর্থ অনলাইন শিক্ষার কৌশল ও শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়কে বেতারের মাধ্যমে সম্প্রচারের মতো দূরক্ষিণ পদ্ধতিসহ শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা এবং সব শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সেবার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

প্রতিবেদনঃ নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে কাপ্তাই হেডম্যান পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্‌বোধন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১৬ই মার্চ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নব নির্মিত রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলার দুর্গম হেডম্যান পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের উদ্‌বোধন করেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বৃষ কেতু চাকমা। অনুষ্ঠান শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্গম গ্রামবাসীর মাঝে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছে। গ্রামীণ জনগণের অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সেবা বিতরণের প্রথম স্তর কমিউনিটি ক্লিনিক। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বলেন, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে বিনামূল্যে প্রায় ৩২ ধরনের ওষুধের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হয়। তাই চিকিৎসা গ্রহণের পাশাপাশি গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে। আলোচনাসভা শেষে তিনি এই কমিউনিটি

ক্লিনিক যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেলক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

আলী কদমে কারিতাসের এগ্রো-ইকোলজি প্রশিক্ষণ

আলী কদমে কারিতাসের এগ্রো-ইকোলজি প্রকল্পের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী তিন ব্যাচে ৯০ জন কৃষককে এগ্রো-ইকোলজি বিষয়ক ফলোআপ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১১ই মার্চ এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়। তিনদিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে ৮ই মার্চ ৩৩ জনকে পশুপালন, ১০ই মার্চ ২৭ জনকে জৈবকৃষি, ১১ই মার্চ ১৫ জনকে বাগান ও ১৫ জনকে জুম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণে কৃষি প্রতিবেশ সংরক্ষণে কৃষকের ভূমিকা, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে চাষাবাদ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রযুক্তি, এগ্রো-ইকোলজি পদ্ধতিতে রোগ ও পোকা দমন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, এগ্রো-ইকোলজির সাথে সমন্বয় রেখে পশু-পালন, কৃষিকাজ, জুম চাষ, বাগান স্থাপনের উপর ফলোআপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রশিক্ষণে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি ও গাছে সার প্রয়োগের উপর হাতে-কলমে ব্যবহারিক প্রদর্শন করা হয়।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

টি-টোয়েন্টিতেও জিম্বাবুয়েকে হোয়াইটওয়াশ বাংলাদেশের

টেস্ট ও তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের পর টি-টোয়েন্টিতেও জিম্বাবুয়েকে হোয়াইটওয়াশ করে স্বাগতিক বাংলাদেশ। এর আগে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৪৮ রানের বড়ো ব্যবধানে হারে শন উইলিয়ামসের দল। ১১ই মার্চ মিরপুরের শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ৭ উইকেট হারিয়ে ১১৯ রান সংগ্রহ করে জিম্বাবুয়ে। ১২০ রানের লক্ষ্যে লিটন দাশের অপরাজিত হাফসেঞ্চুরিতে ভর করে সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে ২৫ বল হাতে রেখে ৯ উইকেটের বড়ো জয় পায় বাংলাদেশ।

মুশফিকের সেঞ্চুরিতে জয় দিয়ে শুরু আবাহনীর

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) জয় দিয়ে শুভ সূচনা করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ঢাকা আবাহনী। মুশফিকুর রহিমের অনবদ্য সেঞ্চুরিতে পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাবকে ৮১ রানে হারিয়েছে আবাহনী। ১৫ই মার্চ মিরপুরের শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে মুশফিকের সেঞ্চুরিতে ভর করে ৭ উইকেটে ২৮৯ রান করে আবাহনী। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪৮.৪ ওভারে ২০৮ রানে অলআউট হয় পারটেক্স। দারুণ সেঞ্চুরির সুবাদে ম্যাচ সেরার পুরস্কার ওঠে মুশফিকের হাতে।

টাইগারদের নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল

অবশেষে সব জল্পনাকল্পনা অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নতুন ওয়ানডে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হলো বাঁহাতি ওপেনার তামিম ইকবালকে। ওয়ানডের অন্যতম সফল অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজার অবসর নেওয়ার দুই দিনের ব্যবধানে নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা দিলো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ৮ই মার্চ মিরপুরের শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) কার্যালয়ে কার্যনির্বাহী সভা শেষে এ ঘোষণা দেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন।

‘শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম’

পণ্য ক্রয় বিক্রয়কালে পারস্পরিক শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন

পিআইডি

ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে যোগ হলো নতুন ক্যাটাগরি

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ‘এ’, ‘বি’ ও ‘সি’ এই তিন ক্যাটাগরির সঙ্গে যোগ করা হয়েছে নতুন ‘ডি’ ক্যাটাগরি। প্রথম তিন ক্যাটাগরিতে মোট ক্রিকেটার থাকছেন ১৪ জন এবং ‘ডি’ ক্যাটগরিতে আরও দুজন ক্রিকেটার যোগ করে মোট ১৬ জন ক্রিকেটার থাকবেন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে।

৮ই মার্চ মিরপুরের বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) কার্যালয়ে বিসিবি পরিচালকদের সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান নাজমুল হাসান পাপন। তবে ক্যাটাগরি অনুসারে ক্রিকেটারদের নাম পরে জানিয়ে দেওয়া হবে জানান তিনি।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

চলে গেলেন সুরকার সেলিম আশরাফ

আফরোজা রুমা

* যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তি সেনা * এই জাদুটা যদি সত্যি হয়ে যেতো * যে বাতাসে ফোটে ফুল * ওই যে দেখা যায় রে * ও মন, রঙ্গীলা ময়ূর * তুমি না থাকলে জীবনে আমার * সে কতবার বলেছিল * চুপি চুপি বকুলতলায় * ওরে অবুঝ মন আমার * আমি তোমাকে গান শোনাব বলে * ও পাখিরে, আমার সোনার পাখিরে * আমি আর আসবো না * যেমন ঐ ধ্রুবতারা * এ জীবন তো অনেক কিছুই চায় * তুমি যে আমার প্রথম ভোরের * তোমরাই প্রেমে পড়ে * এক জনমে যা দিয়েছ মা * ঐ যে দেখা যায়রে, হিজলতলার গাঁয়রে * প্রেম যেন এক প্রজাপতি * এই হৃদয়টাকে মরুভূমি * আমার গাঁয়ের পঞ্চবটির আয় * ও নদী নদীরে... তোর খবর * এ আমার অহংকার। এ রকম অসংখ্য দেশাত্মবোধক ও আধুনিক জনপ্রিয় গানের সুর স্রষ্টা সুরকার সেলিম আশরাফ।

চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ১লা মার্চ দিনগত রাত তিনটার দিকে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর শ্বাসকষ্ট, রক্ত এবং কিডনির সমস্যার কারণে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের চেন্নাইয়ে ১৩ দিন চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরেন সুরকার সেলিম আশরাফ। তখন থেকে কয়েক মাস তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন। এরপর গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর শ্বাসকষ্ট, রক্ত ও কিডনি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করায় রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সে সময় চিকিৎসার ব্যয় নিয়ে সমস্যায় পড়লে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে ১০ লাখ টাকার একটি সঞ্চয়পত্র দিয়েছিলেন। সেই টাকা দিয়ে আবার তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু চলতি বছরের শুরুর দিকে আবারো গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সেলিম আশরাফের চিকিৎসা সহায়তায় এগিয়ে আসেন সাবিনা ইয়াসমিন ও সৈয়দ আবদুল হাদী। এসময় পাশে দাঁড়ান অসুস্থ এন্ড্রু কিশোরও।

সংগীত জীবনে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গানে সুর দিয়েছিলেন প্রয়াত সেলিম আশরাফ। তাঁর সুরে গান গেয়েছিলেন শ্রী আলম আরা মিনুও। সেলিম আশরাফের সুরে যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তিসেনা ও এই জাদুটা যদি সত্যি হয়ে যেতসহ বেশকিছু গান শ্রোতামহলে দারুণভাবে সাড়া ফেলে। আমরা এই গুণী শিল্পীর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 40, No. 10, April 2020, Tk. 25.00

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd